সকালের সাত রং

তপতী রায়

১৯৪৬

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—আড়াই টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে ভানু রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৮ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীবিজয়কুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।

মণীন্দ্র রায়-কে

জাত

হাতটা সজোরে মুচড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল খোঁড়াটা।

কদিন থেকেই লক্ষ্য করছে বিশ্বনাথ এই খোঁড়ার চালচলন। সোহাগীর সঙ্গে বেশ একটু মাখামাখি করবার চেষ্টা করছে সে। বিশ্বনাথ বহুবার সাবধান করতে গেছে সোহাগীকে। উত্তরে সোহাগী শুধু বোকার মত চেয়ে থাকে।

'ন্যাকা সাজে নাকি ?' আপন মনে গজরাতে থাকে বিশ্বনাথ। কিন্তু উপায় নেই। অদ্ভুত জাদু জানে মেয়েটা। কি যে আছে ওর চোখে বিশ্বনাথ ভেবে পায় না। তার মত কড়া মেজাজের লোকও কিছু করতে পারে না যেন।

একটা ভিখারীর দলকে বস্তি থেকে চালিয়ে বিভিন্ন রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া—এই হল বিশ্বনাথের কাজ। মালিকের নাম বনওয়ারীলাল শর্মা। মানুষের দয়ার পয়সায় ভাগ বসানোর পাপকে ধর্মশালায় ধুয়ে স্বর্গের রাস্তা পরিষ্কার করছেন তিনি, নরকের পাহারাদারীর ভার বিশ্বনাথের ওপর। জাতে সে কায়স্থ। লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞেস করলে বেশ গর্বের সঙ্গেই বলে 'থার্ড

ক্লাস'। বাপ মারা যাবার পর গ্রাম থেকে এসে কয়েক বছর হোটেলের কাপ-ডিস্ ধুয়ে আর বিড়ির দোকানের পাতা কেটে পেট চালিয়েছে। হঠাৎ খোঁজ পেয়ে গেল এই চাকরিটার। বেশ চট্পটে দেখে বনওয়ারীলালও তাকে কাজে বহাল করতে দ্বিরুক্তি করেনি।

"তবে আর কি রে, কপাল তো ফিরে গেল! খালি মাইনে নাকি? উপ্রিও আসবে দেখিস্।"

চোখ টিপে ঠাট্টা করেছিল বিড়ির দোকানের মালিক।

"উপরিই বটে", মনে মনে হাসে আজ বিশ্বনাথ। কাজে নেমে প্রথম প্রথম রীতিমত গা ঘিনঘিন করত তার। ভোর না হতেই ঐ নোংরা বস্তিতে ঢোকা! গরীব তো সেও, কিন্তু এরা যেন মানুষ নয়। নোংরা কিল্‌বিলে অন্য জগতের জীব। ঘেন্না করে তার। মারামারি ঝগড়া লেগেই আছে। বঞ্চিত হওয়ার সমস্ত প্রতিশোধ তারা নিচ্ছে পরস্পরকে আক্রমণ ক'রে।

কিন্তু সোহাগীকে দেখবার পর থেকে এ জগতটাই যেন বদলে গেল ওর কাছে। এই চার বছর কাজের ভেতরে আস্তে আস্তে সেই রোগাপটকা বারো বছরের মেয়েটা কবে যে একটি সতেজ যুবতীতে পরিণত হয়েছে, এতদিন তা সে লক্ষ্যই করেনি। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করল তাকে। কোথা থেকে যৌবন আর সৌন্দর্যের এত রসদ পায় মেয়েটা? অবাক হয় বিশ্বনাথ। মালিক যা খেতে দেয় তাতে জীবনটা ধরে রাখা ছাড়া বাড়তি কিছু তো থাকবার কথা নয়, এত পুষ্টি ওর হয় কিসে কে জানে।

সমস্ত শরীরটা নিটোল ছাঁদে গড়া। দেহের প্রত্যেকটি খাঁজ

'আর কিছু না থাক, মেয়েটির গড়নটা বেশ কিন্তু', তারিফ না করে পারে না সে তার বিড়ির দোকানের বন্ধুর কাছে। বন্ধুর কাছ থেকে সায় পেয়ে সাহস তার বেড়ে যায়। ও যেন বুঝেই নিয়েছে যে সোহাগী তারই নিজস্ব সম্পত্তি। খাওয়া-দাওয়া একটু ভাল করার চেষ্টা করে। এরই ভেতর যতটা পারে তলা-কার ঘন খিচুড়ি বেশি করে দেয় সোহাগীর পাতে। খাক মেয়েটা, আহা শুধু তো এই-ই খায়। ভিক্ষের পয়সা থেকে দু পয়সা মুড়ির বরাদ্দও করে দিয়েছে সে। সাধ যায় একখানা কাপড় কিনে দেবার। কিন্তু সাহস পায় না। মালিক বড় জবরদস্ত এ সব বিষয়ে। এর মধ্যেই সোহাগীর জন্যে তার দরদের কথা নিয়ে কানাকানি চলছে ভিখারীদের ভেতর। মাঝে মাঝে টুকিটাকি কথাও কানে আসে।

"কি লা তোর রস যে দিন দিন বাড়ছে, ছিরিও খুলছে বেশ!" টেনে টেনে হেসে বললো সেদিন দুখীর মা সোহাগীকে।

"তা আর বাড়বে না? ওরই তো দিন গো? আমাদের কি আর পদাত্থ বলতে কিছু আছে?" টিপ্পনী কেটে সায় দেয় আর একজন।

"সত্যি লা!"—দুখীর মা জোর দিয়ে বলে, "কপাল ভাল তোর। সরকারবাবুর চোখ আছে তোর ওপর। তোর আর ভাবনা কি?"

"কেনো ?" কথাটা বুঝতে চেষ্টা করে সোহাগী।

"আহা—খুকি।" হেসে গড়িয়ে পড়লো তুখীর মা মতিয়া বুড়ীর গায়ে।

"কিছু বুঝতে পারিস না তু ?" মতিয়া হাসতে লাগলো ফোকলা দাঁতে, "সরকারবাবু যে তোকে পেয়ার করে ?"

"ভাগ্—" বিব্রত বোধ করে সোহাগী, "আমরা যে ছোট নোক।"

"ঈস্, ভারি যে আপসোস দেখি তাই নিয়ে।" ঝাঁঝিয়ে উঠলো তুখীর মা, "কই আমাদের তো অত কথা মাথায় ঢোকে না। সবই বুঝি লো—আর ছেনালি করিস নি মাইরি।"

তাড়াতাড়ি সরে যায় বিশ্বনাথ।

চিন্তার দায় এসে পড়ে সোহাগীর ওপর। কিন্তু সে যে বড় ভয় করে সরকারবাবুকে। তার তাকানো সহ্য করতে পারে না সোহাগী।

রাস্তা পার করবার সময় সবাইকে বাদ দিয়ে সরকারবাবু তার হাত ধরতে যেতেই লজ্জায় পিছিয়ে যায় সেদিন—

"আমি ঠিক যাব বাবু। তুমি মিছে তাগিদ কর কেন ?"

"তাগিদ করি কি আর সাধে ? চাপা পড়লে তো আমারই ভোগান্তি।" ধমক দিল বিশ্বনাথ।

"বাবু!" ও-পাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো খোঁড়াটা, "আমি চাপা পড়লে আর ভোগান্তি নেই বুঝি ?"

"চুপ কর্ হারামজাদা।" খেঁকিয়ে উঠলো বিশ্বনাথ—"অত

তাড়া কিসের। একে একে যাবি তো! পাজি! হারামজাদা!" ভীষণ রাগে খোঁড়ার দিকে তেড়ে যায় সে। নাঃ, ব্যাচ বদলাতেই হবে। সোহাগীর সঙ্গে ওকে রাখা চলবে না।

"তোর তেল দিন দিন বাড়ছে, না?" শক্ত মুঠিতে তার হাত ধরে রাস্তা পার হতে হতে বলে বিশ্বনাথ, "তেল বার করছি রাখ।"

"এই! কেনো বাবুর কথার জোবাব দিচ্ছিস রে?" বিশ্বনাথকে খুশী করার ফিকিরে ধমক দেয় তাকে মতিয়া বুড়ী।

অসম্ভব ভয় করে তাকে এই ভিখারীর দল। তাদের কর্তা তো বিশ্বনাথই। দারোগা যেমন থানার কর্তা, নায়েব যেমন মৌজার। "কাজ কি আমাদের ঘেঁটিয়ে?" বুদ্ধিমান বুড়ো ভিখারীরা সান্ত্বনা দেয় সকলকে, "ভাতে মরবো কি শেষে? যেতে দাও ভাই, যেতে দাও!"

"যেতে দিলে ও শালা একদিন নিয়ে ভাগবে।" প্রতিবাদ করে খোঁড়া, "মালিকের কানে তুলে দিয়ে বোঝাব শালাকে। অত সোজা নয়। শা—লা।" গজগজ করে সে। খোঁড়া পায়ের কাঠ্‌টিকে ভীষণ আক্রোশের সঙ্গে ঠক্ ঠক্ ক'রে ঠোকে সে সিমেণ্টের ফুটপাতে। কাটা পায়ে ঠোকা খেয়ে তার পঁচিশ বছরের তাজা রক্তের ধাক্কা হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। কি একটা সঙ্কল্প করে সে এগিয়ে যায় সোহাগীর দিকে।

"আমরা হলুম গিয়ে এক দলের লোক—ভিকিরী—ও বাবু কেন আসবে আমাদের ভেতর?" ফিস্‌ফিস করে একটা জীবন-

মরণ সমস্যার বিষয় বোঝাবার চেষ্টা করে সে যেন। চোখ মুখ তার শক্ত, তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

"কেনো, বাবু কি করেছে?" বোকার মত জিজ্ঞেস করে সোহাগী।

"কি করেছে? ছুঁড়ির মত বকিস না। আরে মোদের সুখ-দুঃখু মোরাই বুঝবো। ও বাবুর অত মাথাব্যথা কেন? ও কেন আসে তোর খাওয়া দেখতে, তোর হাত ধরতে?"

কেমন যেন কোণঠাসা হ'য়ে পড়ে সোহাগী। হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে ওঠে—"তাতে তোর কি রে?"

"তুই কি ভাবিস বাবু তোকে নিয়ে ঘর করবে? মালিক টের পেলে কি করে দেখিস, তখন মজা বুঝবি।"

"তা নিয়ে তোর অত মাথাব্যথা কেন রে লেঙা? আমার মজা আমি বুঝবো। তুই ভাগ!"

ফল হয় না কোনো, তবু আশা ছাড়ে না খোঁড়া। যৌবনের সহজধর্মে, তাড়া খেয়েও সোহাগীর কাছে ঘোরাফেরা করে।

বিশ্বনাথের নজর এড়ায় না কিছুই। কিন্তু সেদিন সে আর সামলে উঠতে পারল না।

"এই, তোর জায়গা তো ঐ ও-রাস্তায়। তুই এখানে এসে কি করছিস?" কড়া চোখে জিজ্ঞেস করল খোঁড়াকে।

"মোর বাট্‌টে বদলি হয়ে গেছে গো বাবু এর সাথে, তাই

এসেছিনু”—মিথ্যে ব’লে খালাস পাবার চেষ্টা করে খোঁড়া। সোহাগী অবাক হ’য়ে খোঁড়ার মুখের দিকে তাকায় একবার। কিন্তু সত্যি কথাটা ফাঁস করে দেয় না। হঠাৎ তার জন্য একটু মায়াই বোধ করে যেন। হাজার হোক একই দলের লোক তো। না-ই বা জানল বিশ্বনাথ, কেন সে এসেছিল সোহাগীর কাছে। আজকের দিনটা উপবাসের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে সে তাহলে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সোহাগী।

“যা বাটি নিয়ে চলে যা।” ফুটো কলাইকরা বাটিটা বদলে নেয় ওরা,—বিশ্বনাথ বলে, “আর শোন্—রোজগার ঠিক মত না হ’লে খাওয়ার বরাদ্দ কমবে। এখানে এসে খালি খালি গুজগুজ করা বের করব তোর!”

একটি লোক এসে পড়ায় হঠাৎ তার খেয়াল হয়, সে ভদ্রবেশী পথচারী, সামনে যুবতী ভিখারী মেয়ে। অন্য পথিকের চোখে অবস্থাটা বিসদৃশ লাগবারই কথা। তাড়াতাড়ি পয়সা বের করতে গিয়ে একটা আনিই ছুঁড়ে দেয় সে সোহাগীর দিকে। তারপর চট ক’রে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিন্তু কাজের কি আর শেষ আছে? সারাদিন বিশ্বনাথকে কাজের হিসেব নিয়ে বেড়াতে হয়। খুশী মনে নিজের ডেরায় ফিরে গিয়ে যে একটু দিবাস্বপ্ন দেখবে সে উপায় রাখেনি বরাত। ভাদ্র মাসের রোদ্দুর অসহ্য হয়ে উঠছে। তবু তারি মাঝেই ছাতা মাথায় ঘুরে ঘুরে তদারক করে বেড়াচ্ছে বিশ্বনাথ। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে তার। মুখচোখ হয়ে উঠেছে দমফাটা রকম

লাল। নাঃ, আর পারা যায় না। সোহাগীটা না থাকলে কি যে করতো, ভেবেই পায় না। দূর থেকে সে রোজ দেখতে পায় সোহাগীর মুখটা তামাটে হয়ে উঠছে। ফণা-বাঁকানো কটা চুলগুলো শুক্‌নো হাওয়ায় উড়ছে। কেমন একটা মমতা হয় বিশ্বনাথের। মেয়েটাকে কি একটু সুখও দিতে পারা যায় না?

ঘেঙিয়ে চলেছে সোহাগী দুটো পয়সার জন্য চোখ বুজে একটানা সুরে। মানুষগুলোর কি দয়ামায়া নেই? সামনের পানের দোকানে দাঁড়িয়ে একটি বাবু হাসতে থাকে সোহাগীর দিকে চেয়ে। রক্তটা গরম হয়ে ওঠে বিশ্বনাথের। পর মুহূর্তেই দেখতে পায় বিশ্রী রসিকতার সঙ্গে একটা আনি ঠিকরে আসে সেদিক থেকে। চোখ খুলে এক গাল হেসে আনিটা কুড়িয়ে নেয় সোহাগী। সত্যি সত্যি এবার রীতিমত জ্বালা অনুভব করতে থাকে বিশ্বনাথ। কিন্তু কিই বা করতে পারে সে? এদের হাত থেকে সোহাগীকে রক্ষা করতে গেলে একমাত্র যা উপায় তা অসম্ভব। পালিয়ে গিয়ে মালিকের শ্যেনচোখকে ফাঁকি দেওয়া আরও অসম্ভব। অথচ এখানে থাকলে যে আর কিছুদিন পরেই মালিকের অন্য ব্যবসাতে চালান যাবে সোহাগী, এ কথাও স্পষ্টই জেনেছে সে বনওয়ারীলালের কাছ থেকে। না, তার আগেই বাঁচাতে হবে মেয়েটাকে। মনে মনে স্থির করে ফেলে বিশ্বনাথ। আজকের ভেতরই শেষ করবে সব ভাবনার।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। একটা মোটরের হর্নে স্বপ্ন তার ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এদিকে ফিরে তাকিয়ে দেখে—

চোরের মত খোঁড়া এগিয়ে আসছে সোহাগীর দিকে এপাশে ওপাশে তাকাতে তাকাতে। "হারামজাদা বড় বাড়িয়েছে দেখ্ছি।" ছিটকে এগিয়ে যায় বিশ্বনাথ সেইদিকে, রাস্তায় যানবাহনকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না যেন।

একটা ছোট্ট ঠেলা দেয় সোহাগী কি একটা কথায় খোঁড়াকে, আর সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়াও দিল তার গালে একটা ঠোনা। জীবনে কখনও এদের গায়ে হাত তোলে নি বিশ্বনাথ। কিন্তু আর পারল না। মাথার সমস্ত রক্ত যেন বারুদের মত ফেটে পড়বে তার। প্রায় দৌড়ে এসে খোঁড়ার হাতটা সজোরে মুচড়ে দিল বিশ্বনাথ।

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলো খোঁড়া। হাতটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে অদ্ভুত ভাবে এক পায়ে লাফাতে লাগল লেজ মাড়ানো কুকুরের মত।

"কেমন? আর আসবি? মজা পেয়েছিস না? বিশবার বারণ করলেও শোনা হয় না। রস করতে এসেছেন—রস!" আবার একটা চড় কসালো সে। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পেছু হটে চললো খোঁড়া। "আর তুইও ঠিক তেমনি হারামজাদী, কতদিন বলেছি না তোকে?" হাত ধরে টান দেয় সোহাগীর। "দাঁড়া মালিককে বলে তোর কি করি দ্যাখ। চল বাসায়!" বিশ্বনাথ পা বাড়ায়।

রীতিমত ভয় পেয়ে যায় সোহাগী—"হেই বাবু, আমাকে বকো কেনো? ঐ মিন্‌সেই তো"—বিশ্বনাথের লম্বা পায়ের

তালে চলতে চলতে একটানা কৈফিয়ৎ দিয়ে যায় সে।

লম্বা সড়কটা পার হয়ে তারা সোহাগীদের খুপরিটাতে ঢুকলো এসে। বস্তিটা প্রায় খালি। সকলেই দুপুরের কাজে বা ভিক্ষেয় বেরিয়েছে।

"দরজা বন্ধ করে দে।" ধমক দিল বিশ্বনাথ, "ন্যাকামো বাড়ছে দিন দিন না?" এদিক ওদিক চেয়ে মনের খুঁত্‌খুতি চাপা দিয়ে অগত্যা নোংরা মেঝেতেই গা এলাতে যায় সে।

"বাঃ—তুমি!" বিশ্বনাথের বর্তমান অবস্থা ও অবস্থানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না সোহাগী।

"এক্ষুনি যাবার জন্য এতটা পথ এলুম?" খেঁকিয়ে উঠলো বিশ্বনাথ। তারপর নিজেই পা দিয়ে দরজার পাল্লা দুটো জোড়া লাগিয়ে দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গেই দু হাতে বুকে জড়ায় সোহাগীর পাত্‌লা দেহ। বহুদিনের অতৃপ্ত ক্ষুধা আজ যেন আস্ত মেয়েটিকেই গ্রাস করবার জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে। মুচড়ে, দুমড়ে একাকার করে দিতে ইচ্ছে করে সোহাগীকে।

"ছাড়ো বাবু লাগে।" প্রায় কেঁদে ফেলল সোহাগী এই অভাবনীয় ব্যাপারে।

"থাম্‌!" বিশ্বনাথ ফিসফিসিয়ে বলল, "তোর ভাল লাগে না আমাকে? চল্‌ না আমরা দুজনে গিয়ে ঘর বাঁধি। তোকেও আর ভিক্ষে করতে হবে না। কেমন রাজি তো?"

বুঝতে পারে না সোহাগী, এ সুখ না শাস্তি! জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করে, "আমরা ছোটনোক—গরীব—ভিকিরী—"

"সে তোকে ভাবতে হবে না। তুই যাবি কিনা বল্?" ছ-হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল বিশ্বনাথ। "সারাজীবন তো এভাবে কাটবে না সোহাগী। একা একা থাকলে মন্দ লোকের খপ্পরে তোকে পড়তেই হবে। আমাকে তোর বিশ্বাস হয় না বুঝি?"

বোকার মত চেয়ে থাকে সোহাগী। পাগলের মত কি সব যা তা বক্‌ছে বাবু! তাকে বাবুর এত দরকার?

"চল্ আমরা ছজনে গিয়ে ঘর বাঁধি! তোকেও আর ভিক্ষে করে খেতে হবে না, আমারও ভাল লাগে না এ জীবন। বুঝলি?" আবার বলে বিশ্বনাথ।

ঘাড় নাড়ে সোহাগী। সবই বুঝেছে সে। এই ছুপুর রোদে তাকে আর ঘেঙাতে হবে না। গেরস্থ ঘরের বৌ-ঝির মত থাকতে পারবে, এত সোজা কথা বুঝতে ভিখারীদের দেরি হওয়ার কথা নয়।

আশ্বস্ত হয় বিশ্বনাথ। তারপর চলে তাদের আরো অনেক আলাপ, প্রায় একতরফা। ভবিষ্যৎ জীবনটা কথায় কথায় তাদের বর্তমান উপস্থিতির মতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যে নাগাদ বিশ্বনাথ বেরিয়ে এল সোহাগীর ঘর থেকে।

কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে। আস্তে আস্তে পা ফেলছে সে, একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে তার মন ভরে উঠেছে যেন। নিজের কাছেই তার নিজের দাম বেড়ে গেছে।

বড় রাস্তায় এসে চলবার গতি বাড়িয়ে দিতে হয়। এখন যেতে হবে আবার সব ভিখারীদের জড়ো করে আনতে। কিন্তু আজ আর তার বিরক্তি লাগছে না। আর ক'দিনই বা। নিজের মত করে জীবন শুরু করবার আগে এই অসহায় ভিখারীদের ওপর কেমন মায়াই অনুভব করছে সে যেন। এদের প্রতি নিজের দুর্ব্যবহার ও অবিচারের কথা স্মরণ করতে গিয়ে আজ সবার আগে মনে আসে খোঁড়ার কথা। আহা অতটা জোরে হাতখানা না মোচড়ালেই চলত। তারই খোঁজ আগে নেবার জন্যে তাগিদ বোধ করে বিশ্বনাথ।

কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না খোঁড়াকে। গেল কোথায় লোকটা? লাগেনি বোধ হয় বেশি। আর লাগলেই বা সে কী করতে পারে? সোহাগীর সঙ্গে ভাব জমাতে না এলেই পারতো। নিজের কৃতকর্মের জন্য একটু সাজা তার পেতে হবে বৈকি।

কাজ শেষ করে বস্তিতে ফিরে আসতে বেশ একটু রাত হয়ে গেল বিশ্বনাথের। বাচ্চা একটি ছেলে মায়ের কোলে সন্ধ্যে থেকে ঘেঙাতে সুরু করেছে, হরেক কোলাহলের মধ্যে সেই শব্দটাই বিরক্তিকর লাগে।

"থামা তোর ছেলেকে।" বিরক্ত হয়ে পথচলতি ধমক ছড়িয়ে

যায় বিশ্বনাথ। এই সব ক্লেদাক্ত আবহাওয়ায় আর যে তাকে থাকতে হবে না এইটেই ভরসা।

চোখের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। পায়ের নীচে নোংরা গলি। চলতে চলতে সোহাগীর ঘরের দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো বিশ্বনাথ। দরজাটা ঈষৎ ফাঁক। দূরের গ্যাসের আলোয় ছোট খুপরিতে মানুষের অস্তিত্ব বোঝা যায়। সোহাগীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে রয়েছে—ও কে? খোঁড়া না? বিশ্বনাথ চোখের জ্যোতি তীব্র করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সামনের দৃশ্যে ভুল দেখবার কোন ফাঁকই যে নেই। আরামে চোখ বুঁজে শুয়ে রয়েছে খোঁড়া, আর তার মোচড়ান বাহুতে হাত বোলাতে বোলাতে অনর্গল বকে চলেছে সোহাগী। মাঝখানে একটা কথা তীরের মত ছুটে এসে বিঁধে যায় তার কানে। "চল্ তুজনে ঘর বাঁধি। আর ভাল লাগে না এ বিস্তি।"

ঠিক এই প্রস্তাবই কি একটু আগে সোহাগীকে সে নিজে জানায় নি?

"শালার জাত যাবে কোথায়?" দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে উচ্চারণ করে বিশ্বনাথ। তারপর হাতের আধপোড়া বিড়িটার দিকে নজর পড়ায় মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে পা দিয়ে পিষতে থাকে।

পুনর্নবা

ট্রেন প্লাটফরম ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে লোকটি দরজা ঠেলে কামরায় ঢুকল, তাকে দেখে অবাক না হয়ে পারল না স্বর্ণলতা। ভুল হবার নয়। তেমনিই আছে। বয়সের কোন ছাপই পড়েনি, কেবল চুলের রং একটু ফিকে হয়েছে যেন।

'একি!' তার মুখ দিয়ে কথাটা যেন বেরিয়ে যায়। তারপর যেন নিজের মনেই আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে, "সমরেশ!"

পা দিয়ে দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে সিগারেটে আগুন ধরাতে ধরাতে উত্তর দিল সমরেশ, "তাই তো মনে হচ্ছে।"

স্বর্ণলতাকে দেখে সে কি নিজেও অবাক হয়নি?

গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিল স্বর্ণলতা। "এখান থেকে হঠাৎ?" সহজ হবার চেষ্টা করে স্বর্ণলতা।

"বসতে পারি?" কথার উত্তর না দিয়ে সমরেশ বলল।

ছড়ানো পা দুটি গুটিয়ে নিয়ে সমরেশকে বসবার জায়গা করে দিয়ে মৃদু গলায় বলল স্বর্ণলতা, "নিশ্চয়ই।"

"তার পর?" দীর্ঘ একটা ধোঁয়ার রিং ছাড়ল সমরেশ, "খবর কি?"

ও পাশের বার্থে এক অবাঙালী ভদ্রলোক ছাড়া আর কেউ নেই এ কামরায়। তবু তারই দিকে একবার তাকাল স্বর্ণলতা।

"কেমন আছ? বেশ ফর্সা আর মোটা হয়েছ কিন্তু!"

সিগারেটের ছাই জানালার বাইরে ঝাড়তে ঝাড়তে প্রশ্ন করল সমরেশ। আর ওর নির্লজ্জতায় মরমে মরে যেতে লাগল স্বর্ণলতা।

"কতদিন বাদে দেখা, কোন কথাই বলবে না নাকি?" আবার প্রশ্ন করল সমরেশ।

"দেখা না হলেই তো ভাল ছিল।" আস্তে আস্তে বলে স্বর্ণলতা।

"এ্যাকসিডেণ্ট! চাইলেই তো এড়ানো যায় না সব সময়। কি আর করবে বল?"

"এখান থেকে হঠাৎ উঠলে যে?" তার আগেকার প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করে স্বর্ণলতা।

"কারণ এ স্থলেই অধীনের থাকা হয়।"

"এই পাণ্ডববর্জিত দেশে তোমার মত লোক থাকতে পারে?" সহজ হবার চেষ্টা করে স্বর্ণলতা।

সমরেশকে দেখা অবধি তার বুকের হৃৎস্পন্দন যে ভাবে দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছিল, তার মুখের রক্তোচ্ছ্বাসে কি তার কোন আভাসই ছিল না?

"আমার মত লোকেরই তো এমন জায়গায় থাকা উচিত। কি বল? লোকালয়ে বাস করার মত ভদ্রতা আমার আছে?"

আর একবার স্তম্ভিত হয়ে যায় স্বর্ণলতা। এ কথা নিয়ে পরিহাস করতে পারার মত মানুষও হয়। ও কি সবই ভুলেছে? সমরেশের নির্লজ্জতায় যেন নিজেই লজ্জা পায়

স্বর্ণলতা। ভাব গোপন করতে গিয়ে মুখটা জানালার দিকে ফিরিয়ে নেয় সে। কিন্তু সমস্ত মুখটা তার লাল হয়ে যায়।

"কী হল ?" সমরেশ হাসি হাসি ভাবটা বজায় রাখে। কিন্তু স্বর্ণলতার মুখ দেখে হাসতে গিয়েও থেমে যায়। সে বলে—

"না, তুমি ঠিক তেমনি আছ দেখছি। অল্পতেই চটে যাও। এবার সিরিয়াসলি বলছি, তোমার খবর বল !"

"খবর আর কি ? চলে যাচ্ছে।" নির্বিকার ভাবটা যেন বজায় রাখবার চেষ্টা করে স্বর্ণলতা।

"চলে তো যাবেই ! আমারও যাচ্ছে, তোমারও যাবে। তবুও জ্ঞাতব্য কিছু তো থাকে !"

"কিছুই না—"

"তাহলে ওল্ড মিস স্বর্ণলতা সেনই আছ ?"

"সমরেশ !" প্রায় ধমক দেয় স্বর্ণলতা।

"কি হল ?" হঠাৎ অবাক হয় সমরেশ।

"কিছু না।"—কোলের বইখানা তুলে নেয় স্বর্ণলতা। ওপাশের ভদ্রলোক তার বার্থ থেকে পা নামিয়ে বসে সোজা তাকান ওদের দিকে। তার দিকে একবার দেখে নেয় সমরেশ, তারপর ভারী গলায় ডাকে, "লতা !"

"প্লীজ—" প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে স্বর্ণলতা।

"শোন— আমার কথা তোমার শোনা প্রয়োজন, আমার অপরাধ—"

"না।" ততক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে স্বর্ণলতা। "কোন প্রয়োজন নেই। আর অপরাধই বা কিসের ?"

"কিসের তা তুমি ভালই জান।"

জানে বৈকি। দীর্ঘ সতের বছর ধরে তিল তিল করে এ কথাটাই কি সে মর্মে মর্মে জানছে না ? কিসের জন্য আজ তাকে সুদূর পশ্চিমে থাকতে হচ্ছে ? শুধু কলকাতা নয়, বাংলা দেশেও থাকা তার পক্ষে সম্ভব হল না। সে আজ কতদিন। এক যুগ নয় ?

"লতা !" আবার ডাকে সমরেশ। কোন উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করে না স্বর্ণলতা। বই-এর পাতা উল্টে পড়া শুরু করে।

সমরেশ আবার বলে—"সত্যি লতা, কি রকম বদলে গেছ তুমি। অতীতকে একেবারে মুছে ফেলেছ নাকি ?"

অতীতকে মোছবার সাধ্য যদি থাকত তাহলে তাকে মুছেই ফেলত লতা। কিন্তু ক্লাস পালিয়ে গঙ্গার ধারে আর বোটানিক্সে বেড়ানো দিনগুলো, বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় তাদের দোতলার ঝুল বারান্দায় একসঙ্গে কবিতা পড়া, কোন তুচ্ছ ক্ষণের কথাই কি সে ভুলতে পেরেছে ? ভুলতে সে চেয়েছে, ভেবেছে এই দীর্ঘ সতের বছরে অনেক কিছুই সে ভুলেছে ; কিন্তু আজ সমরেশকে দেখে সে নিঃসংশয়ে বুঝেছে, অতীতের মুহূর্ত টুকুও ভোলা তার দ্বারা সম্ভব হয়নি।

পাশাপাশি বাড়ীতে নয়, এক পাড়াতেও নয়। একেবারে

দুই প্রান্তের বাসিন্দা তারা, টালিগঞ্জ আর শ্যামবাজার। তবু দুটি সমান্তরাল রেখার মত তারা চলতে পারল না। মিলতে হল কোনো এক সময়ে। সে আজ কতদিন।

প্রথম প্রথম যখন তারা অত ঘনিষ্ঠ হয়নি, তখনই সমরেশের নামে তার বান্ধবীদের কাছে কত কথা শুনত। সে নাকি বড়-লোকের চালিয়াৎ ছেলে। একেবারে মাকাল ফল। জীবনকে তারা নাকি রূপ আর টাকা দিয়েই চেনে। কিন্তু কোনদিনই বিশ্বাস করেনি সে কথা স্বর্ণলতা। সমরেশ—সমরেশই। হতে পারে স্বর্ণলতা কালো। কিন্তু এমনও তো দেখা যায় যে কালো কুরূপ মেয়েকে তার অতি সুপুরুষ বিত্তবান স্বামী অসম্ভব ভালবাসে! তবে তারও যে হবে না, সমরেশের মত দুর্লভ রূপবান ছেলে যে তাকেও পছন্দ করবে না, এরকম মনে হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? আসলে এ সমস্তই ঈর্ষা। মনে মনে ভেবেছিল স্বর্ণলতা। আর ততই তাদের দেখিয়ে দেখিয়ে মিশে-ছিল স্বর্ণলতা সমরেশের সঙ্গে।

"কী ভাবছ?"

"কিছু না।" জানলার বাইরেই তাকিয়ে রইল স্বর্ণলতা।

"চোখে কয়লা পড়তে পারে।" স্বর্ণলতার কোলে-রাখা বইটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল সমরেশ।

কোন উত্তর না দিয়ে দূর দিগন্তে তাকিয়ে রইল স্বর্ণলতা। আর মনে মনে ভাবল, কি অদ্ভুত সহজ হতে পেরেছে সমরেশ। নিঃশেষে সব কিছু ভুলেছে। অথচ সেই দিনটির কথা কি সে

নিজে কোন দিন ভুলতে পারবে ?

রাত হয়ে গেছে। উত্তর কলকাতার একটা গানের জলসা থেকে বাড়ী ফিরছিল সে আর তার বান্ধবী উমা। বাসের জন্ত বহুক্ষণ দাঁড়াতে হচ্ছিল। হঠাৎ বড় কালো গাড়ীটা পাশে আসতেই চম্‌কে উঠেছিল তারা।

"কোথায় যাচ্ছেন ?"

সজোরে একটা চিমটি কেটে উমা তাকে ফিসফিসিয়ে বলেছিল, "তোর মালঞ্চের মালাকর !"

"যাঃ !" সলজ্জ একটা ঠেলা দিয়েছিল স্বর্ণলতা। ততক্ষণে গাড়ীটা থেমেছে। হাত বাড়িয়ে পিছনের দরজাটা খুলে দিয়ে সমরেশ তাদের আহ্বান জানাল, "আস্থন না পৌঁছে দিই। ট্রামে-বাসে যা ভিড়। ফিরতে কষ্ট হবে।"

"ও আমাদের অভ্যাস আছে।" উমা বলেছিল, "তাছাড়া আপনি কেন মিছিমিছি অতদূর কষ্ট করে যাবেন ?"

"মিছিমিছি কষ্ট ? মনস্তত্ত্বে জ্ঞান তো আপনাদের বেশ পাকা দেখছি !" হেসে উঠেছিল সমরেশ—"নিন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর বেশী দেরি করবেন না। ভেতরে আস্থন।"

উমাকে তার চৌরঙ্গী টেরাসের ফ্ল্যাটে ছেড়ে দিয়ে গাড়ী যখন হরিশ মুখার্জি রোডে এল, হঠাৎ গাড়ীর মুখ ঘোরাল সমরেশ।

"মিস্‌ সেন, আপনার ফিরতে দেরি হলে বিশেষ অস্থবিধা হবে ?"

দেরির আর বাকী কি? ভেবেছিল স্বর্ণলতা। তবু এ সন্ধ্যাটা এমনভাবে এখানেই শেষ করতে তার সত্যিই ইচ্ছে করছিল না। নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল স্বর্ণলতা, প্রায় ফিস-ফিসিয়ে বলার মত, "কেন?"

"তাহলে একটু গঙ্গার ধারটা ঘুরে যেতাম।"—অবশ্য গাড়ী ততক্ষণে গঙ্গার দিকে বেশ কিছুটা এগিয়েছে।

"পিছনে বসে থাকলে কারও সঙ্গে কথা বলা যায় না। সামনে আসতে আপত্তি আছে?"

"আপত্তি! না আপত্তি আর কি? কিন্তু আমি বেশী দেরি করব না। পিসীমা বকবেন।" গাড়ী একটু থামলে সামনে এসে বসতে বসতে বলল স্বর্ণলতা। আর কোন উত্তর না দিয়ে ঝুঁকে পড়ে গাড়ীর দরজা বন্ধ করল সমরেশ।

গঙ্গার ধার দিয়ে পীচঢালা মসৃণ চওড়া যে রাস্তাটা কুমারীর সাদা সিঁথির মত চলে গিয়েছে, সেখানে এসে গাড়ীর গতি মন্থর করল সমরেশ।

"মিস সেন!" ভারী গলায় ডাক এল সমরেশের কাছ থেকে।

ভীরু পাখীর মত কাঁপছিল স্বর্ণলতার বুক। আজ এক বছর কি এমন দিনেরই সে প্রতীক্ষা করছিল না? কিন্তু সাহসটা বোধ হয় বড্ড বেশী হচ্ছে। কি বলবে ভেবে পেল না।

"সত্যি মিস সেন, স্বপ্নেও ভাবিনি আমার এ সৌভাগ্য হবে! আপনি—" কি যেন বলতে গিয়ে থামল সমরেশ।

স্বর্ণলতা টের পায়, বুঝতে পারে কী বলতে চায় সমরেশ। ওর নিজের গলাটাও যেন আবেগে আটকে আসছে। কোন কথা বলতে বুঝি ভাল লাগছে না। খালি চুপ করে থাকা, খালি প্রাণ ভ'রে উপলব্ধি করা।

"আপনার সেদিনের রেসিটেশনটা সত্যি অপূর্ব হয়েছিল।"

বাস্তব জগতে ফিরে এল স্বর্ণলতা সমরেশের কথায়।

"আহা!" মৃদুগলায় প্রতিবাদ করে স্বর্ণলতা।

"সত্যি আমি ভাবতেও পারিনি, কোন মহিলার মুখ থেকে এ রকম জোরালো স্পষ্ট উচ্চারণের সঙ্গে কবিতা শোনা যেতে পারে। বিশেষ করে আপনাকে দেখলে তো বোঝাই যায় না। এমন শান্ত লাজুক চেহারা আপনার।"

"মহিলারা বুঝি কেবল নরম করেই কথা বলেন? এ আপনার ভুল ধারণা।" এতক্ষণে নিজেকে যেন ফিরে পায় স্বর্ণলতা, "আমি এ কথার প্রতিবাদ করছি।"

"প্লিজ মিস সেন! আজকের সন্ধ্যাটুকু আর বিতর্ক করে নষ্ট করবেন না।" একহাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্যহাতে ঈষৎ চাপ দিয়েছিল সমরেশ স্বর্ণলতার কাঁধে, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণলতা বুঝেছিল, সে মরেছে। শিউরে উঠেছিল সে।

দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল স্বর্ণলতা। তার মন যে এত বেশী প্রস্তুত ছিল, সে নিজেও জানত না। বন্ধ দরজা যেন অল্প একটু টোকার অপেক্ষা করছে।

"স্বর্ণলতা দেবী!" ভারী গলায় টেনে টেনে বলেছিল

স্বার্থের ভদ্রলোকটি যে নেমে যাবেন তা কে জানত? আবার যখন ট্রেন চলতে সুরু করল তখন স্বর্ণলতা রীতিমত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

"যদি চা-টা তৈরী করে দাও।" ট্রে-টা স্বর্ণলতার দিকে ঠেলে দিল সমরেশ। "এসব নিজে করে খাওয়ার অভ্যেসটা এখনও আয়ত্ত করতে পারিনি।"

চা তৈরী করে দেবার লোকের অভাব বোধকরি নেই, স্বর্ণলতা ভাবল। কিন্তু প্রশ্ন করে কথা বাড়াবার ইচ্ছে তার ছিল না।

এক কাপ চা ঢেলে সমরেশের দিকে কাপটা এগিয়ে দিল স্বর্ণলতা। তারপর হাত গুটিয়ে আবার পাশ ফিরে জানলার বাইরে মুখ ফিরিয়ে বসল সে।

"ওকি তুমি নিলে না?" সত্যিই অবাক হল সমরেশ।

"আমি তো বলেছি, চা খাই না।"

"না লতা, তা হবে না। একসঙ্গে চা খাব বলেই তো নিলাম।"

"সমরেশ, দোহাই তোমার, অত ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা ক'র না।"

রীতিমত লাল হয়ে গেল সমরেশের ফর্সা টুকটুকে মুখ। কাপ থেকে খানিকটা চা তার দামী ট্রাউজারে পড়ে গেল। ট্রেনের গতি তখন খুব বেড়ে গিয়েছে।

নিজের ভেতর ডুবে গেল স্বর্ণলতা।

ঘনিষ্ঠ হবার প্রয়োজন এখন ফুরিয়েছে। খুব বেশী রকমের

ঘনিষ্ঠই কি হয়নি তারা এককালে ?

যেদিন অনেক রাত হয়ে গেল বলে তাদের বাড়ীর একটি ঘরে রাতের মত সমরেশকে থেকে যেতে বললেন পিসীমা, সেদিন কি বৃষ্টি। সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টিতে রাস্তায় রীতিমত জল দাঁড়িয়ে গেছে, ওদের সে খেয়ালও ছিল না। বাইরের ঘরে তার বাবার মক্কেলরাও সব চলে গেছে। শুধু দুরূহ কোন আইনের কৌশল জেনে নেবার জন্য তার বাবা মোটা মোটা বই-এর পাতা উল্টে চলেছেন।

"সমরেশ, বড্ড বৃষ্টি বাবা। কি ক'রে যাবে ? গাড়ীও তোমার চলবে না। আমাদের এই গলিটায় বড্ড জল জমে।" এসে বলেছিলেন পিসীমা।

"তাছাড়া টালিগঞ্জের ব্রীজটার তলায় এত জল জমে যে কোন মতেই পেরোতে পারব না। কি করি বলুন তো পিসীমা ? এত রাত হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি।"

"এক কাজ কর তাহলে। আজ এখানেই থেকে যাও। লতুর বাবাও তাই বলছিলেন।"

ভীষণ খুশি হয়েছিল স্বর্ণলতা। কিন্তু স্বপ্নেও কি সে ভেবেছিল দু'খানা মেঘেই বাজপোরা ছিল ?

বর্ষার ঝিমঝিম শব্দে ঘুম আসছিল না সেদিন। কিছুতেই ভুলতে পারছিল না স্বর্ণলতা যে আজ সমরেশ তাদেরই বাড়ীতে। বারান্দার ও-পাশে সামান্য পথটুকু শুধু। কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল। উঠে সে হাতে মুখে জল দিল।

নীচে ঝি-চাকরদের জটলা তখনও শেষ হয়নি। জানলা খুলে দিতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা ভেজা হাওয়া ঘরে ঢুকল আর অন্ধকারে সাপের গায়ে পা দেওয়ার মত শিউরে উঠল স্বর্ণলতা। দরজায় টোকার শব্দ শুনে ধড়মড়িয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল।

"কে?"

"আমি গো।"

মতির মা। দেখতে এসেছে ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ আছে কিনা।

রাত্ত বাড়ল।

কে যেন ডাকছে না?

"কে?"—আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল স্বর্ণলতা। সে কি স্থির জেনেছিল এ মতির মা নয়?

"আমি—দরজা খোল।"

একটু ইতস্ততঃ করে দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল স্বর্ণলতা। তার হাত-পা তখন কাঁপছে।

"ভিজে যাচ্ছি লতা। দরজা খোল।"

চিন্তা করবার শক্তিটুকুও বুঝি স্বর্ণলতা হারিয়েছে। তা না হলে তার হাত খিলের কাছে যাবে কেন?

একটা স্টেশনে ট্রেনটা শব্দ করে থামতেই স্বর্ণলতা সম্বিত ফিরে পেল। সমরেশের দিকে তাকিয়ে দেখল সেও যেন অন্য-মনে কী ভাবছে। স্বর্ণলতা তার হাতের বইয়ে সেই একই খোলাপাতায় চোখ ফেরাল আবার।

তারা এগিয়েছিল অনেক দূর, নিশ্চিত পরিণতি জেনেই। আর লতা তার অনেক আগেই জেনেছিল এ থেকে তার অব্যাহতি নেই।

পিসীমাই কথাটা পেড়েছিলেন সমরেশের কাছে। কিন্তু সমরেশ যেন অবাক হয়েছিল সব থেকে বেশী।

"সে তো আমি জানিই পিসীমা। কিন্তু আমাকে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দিন।"

"তোমরা বড়লোকের ছেলে বাবা। তোমাদের অভাব কিসের? তুমি রোজগার না করলে তোমার বৌ কি খেতে পাবে না?"

"খেতে পাওয়াই তো সব নয় পিসীমা। লতাকে তার যোগ্য সম্মান দিয়ে নিয়ে যেতে চাই।"

"সে তো ভাল কথাই। বাধাটা কিসের?"

"বাধা আর কিছুই নয়। এখন যদি আমি বিয়ে করি, তাহলে আমার সব কেরিয়ার মাটি হয়ে যাবে। আমার বিলেত যাওয়ার যে সবই ঠিক হয়ে গেছে।"

মনে মনে আর্তনাদ করে উঠেছিল স্বর্ণলতা।

"সে কি বাবা!" পিসীমা তবু হাল ছাড়েন নি, "বেশ তো, বিলেত যেতে চাও, তা বিয়ে করে যাও না!"

"তা হয় না পিসীমা। বাবা-মা কারও মত নেই। আমি তাঁদের বলেছিলাম।"

"সমরেশ!" পিসীমার গলায় অন্য সুর। "এসব কথা

আগে ভাবতে হয়। তোমার মত শিক্ষিত ছেলের এই ব্যবহার ? কিন্তু লতুকে বৌ করায় তোমার বাবার আপত্তিটা কিসের শুনি ?”

“পিসীমা !” পিসীমাকে চুপ করাতে চেয়েছিল স্বর্ণলতা।

“তুই ছাড় লতু !—না, তোমায় বলতেই হবে সমরেশ। এসব ছেলেখেলা করবার বয়স তো তোমার আর নেই !”

“আমি তো বলছি, বিলেত থেকে ফিরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তবে বিয়ে করব।”

“আর তোমার এই মুখের কথায় নির্ভর করে লতু আমার অপেক্ষা করে থাকবে ততদিন, কি বল ? কবে তুমি এসে ওকে গ্রহণ করে ধন্য করবে, তাই না ?”

“কি করব বলুন ? বাবা বড় ঘরের সুন্দরী মেয়ে চান। কালো বৌ ঘরে আনবেন না।” সমরেশের নির্লজ্জতায় মরে গিয়েছিল স্বর্ণলতা। তার চোখের সামনে দমকা হাওয়ার ঝাপটে যেন একটা রঙিন পর্দা খসে পড়েছিল, আর সেই নিরাবরণ বাস্তবে আসল সমরেশকে স্পষ্ট দেখতে পেল সে।

কানে এল, পিসীমা তবু জিজ্ঞাসা করছেন—“আর তাঁর বাধ্য ছেলে ? তাঁরও নিশ্চয়ই ঐ মত !”

সমরেশ চুপ করে থেকেছিল। আর স্বর্ণলতা খাটের বাজুটাকেই আঁকড়ে ধরে নিজের শরীরটাকে খাড়া রেখেছিল।

“সমরেশ ! আর এক মুহূর্তও তুমি এখানে থেকো না। তোমার মত লোকের গলায় মালা দেওয়ার চেয়ে লতুর আমার

মরা ভাল। তুমি যাও।"

জ্ঞান হারাবার আগেই স্বর্ণলতার শিথিল দেহ পিসীমাই ধরে ফেলেছিলেন।

কিন্তু কথাটা প্রকাশ পেয়েছিল তারও অনেক পরে। সমরেশ বিলেত চলে যাওয়ার তিনমাস বাদে।

"কি হবে হতভাগী?" পিসীমা কপালে করাঘাত করেছিলেন।

কোন উত্তর দেয়নি স্বর্ণলতা। আর দেবার ছিলই বা কি? পরিপূর্ণ আত্মসমর্পনের আগে কি তার ভাবা উচিত ছিল না?

"সমরেশকে আমি লিখি। এ কথা জানলে সে ফিরে আসবে। তার দায়িত্ব তো আছে!"

কিন্তু স্বর্ণলতার প্রবল বাধায় সে প্রস্তাবও শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি। পাকে পড়ে বাধ্য হয়ে তাকে গ্রহণ করার কোন মূল্য নেই। তাহলে নিজেকেও সে জীবনে ক্ষমা করতে পারবে না।

অসময়ে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছিল স্বর্ণলতা সুদূর পশ্চিমের এক গ্রামে। সে মেয়ে বেঁচেছিল মাত্র দু'ঘণ্টা। আর তার দু'মাস বাদেই ফিরে এসেছিল স্বর্ণলতা তাদের কলকাতার বাড়ীতে।

কিন্তু এই অভাবনীয় ব্যাপারে বাবা এত ভেঙে পড়েছিলেন যে বছর খানেকের ভেতরেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। ভাবলেও কেঁপে ওঠে স্বর্ণলতা।

দু-তিনটে স্টেশন পার হয়ে গেছে কখন খেয়াল হয়নি

স্বর্ণলতার। সমরেশ যেন অন্য জগতে আছে। তার সিগারেট খাওয়াও বন্ধ হয়েছে। কিছুক্ষণ আগের অপমানটা সে ভুলতে পারছে না বোধ হয়।

গাড়ী যখন গাজিয়াবাদ স্টেশনে আসল, তখন চা-এর সরঞ্জাম ফেরৎ নিতে এল বেয়ারা। তাকে দাম মিটিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সমরেশ। স্বর্ণলতা তার স্যুটকেসটা বার্থের তলা থেকে টেনে বার করল।

"স্বর্ণলতা শোন!" প্রায় তার মুখোমুখি দাঁড়াল সমরেশ। "আমি অন্য কামরায় যাচ্ছি। তোমাকে আর বিরক্ত করব না। কিন্তু—কিন্তু তার আগে আমার একটি কথার উত্তর তোমায় দিতে হবে।"

"আমি এই স্টেশনেই নামব।" ওর কথার উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়ায় স্বর্ণলতা।

"গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়াবে। ভয় নেই, সময় আছে।"

"কিন্তু আমায় সময় নেই।" শুকনো গলায় জবাব দেয় স্বর্ণলতা।

"সময় নেই বললে হবে কেন স্বর্ণ। তোমার কাছে অপরাধী হয়ে আছি। এতদিন বাদে যদি সুযোগ পেলাম তো ভারমুক্ত হব না?"

"কোন প্রয়োজন নেই!"

"কিন্তু আমার আছে স্বর্ণলতা। জানি এতদিন বাদে একথা বলতে যাওয়ার কোন অর্থ নেই। কিন্তু একটা কথা তোমায়

বিশ্বাস করতে হবে।"

আবার বিশ্বাস।

"শোন লতা। একথা ঠিক, প্রথমে আমি সত্যিই দায় এড়াবার জন্য পালিয়ে গিয়েছিলাম। পরে যখন ভুল বুঝতে পারলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম জীবনের ও অধ্যায়টুকুকে ভুলে গেছি। কিন্তু আজ তোমাকে দেখে আবার নতুন করে বুঝছি ব তবড় ক্ষতি আমার হয়েছে। আর তোমারও যে কি ক্ষতি আমি করেছি লতা, তোমাকে—"

"সমরেশবাবু!" সমস্ত রক্ত যেন স্বর্ণলতার মুখেই এসে গেছে—"আপনাকে জাননো প্রয়োজনো যে আপনি কোন ভদ্র-মহিলার সঙ্গে কথা বলছেন।"

"লতা!" প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে সমরেশ।

"লতা নয়। মিসেস স্বর্ণলতা ডেভিড। আর জেনে রাখুন, কোন ক্ষতি আপনি আমার করতে পারেন নি। জগতে মহৎ লোকও দুর্লভ নয়। আমার স্বামী আমাকে স্টেশনে নিতে এসেছেন। নমস্কার।"

চিত্রার্পিতের মত পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায় সমরেশ। আর দরজা খুলে নামবার সময় এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে স্বর্ণলতার হাত ধরে তাকে সাহায্য করেন।

সহকার

খাবারের ঠোঙাটি হাত থেকে পড়ে গেল অমিতার।

"শেষকালে ঘুষ নিলে?" সমস্ত গা ঘিনঘিন করতে লাগল তার স্বামীকে একথা জিজ্ঞেস করতে।

"তাছাড়া উপায় কি?" নির্বিকারভাবে কোটটি আলনায় রাখতে রাখতে বললেন বিপিনবাবু।

বেশ খুশিই হয়েছিল সে হঠাৎ খাবার দেখে। এসব আনার অভ্যেস বিপিনবাবুর নেই। খাবার তো দোকানেই রয়েছে, সেখানে বসে খেলেই যখন ইচ্ছাপূরণ হওয়া সম্ভব তখন মিছি-মিছি মোট বইবার বোকামি আর কেন? কিন্তু ঘুষের টাকায় কেনা খাবার? ছিঃ।

বয়সের ও স্বভাবের অনেক বেশি তফাৎ থাকা সত্ত্বেও বিপিন-বাবুকে বেশ মেনেই নিয়েছিল অমিতা। স্বভাবতই বিপিনবাবু কড়া মেজাজের লোক। তাছাড়া অমিতা এও জানে—স্বার্থের খাতিরে না করতে পারেন বিপিনবাবুর কাছে এমন কাজ খুব কমই আছে। তবু শেষকালে তাঁর অর্থ-লালসা যে এমন একটি সর্বনাশের পথ নেবে, এতটা কল্পনা করতেও তার বাধা ছিল। চমক ভাঙল বিপিনবাবুর ধমকে।

"ওকি, খাবার ফেলে দিলে কেন?" ঠোঙাটি এমনিই পড়ে গিয়েছিল নিজের অজান্তে, কিন্তু সেই আকস্মিক ঘটনার ওপরেই

নিজের ইচ্ছাকে আরোপ করে অমিতা উত্তর দেয় এবার ঃ

"ও খাবার ছেলের মুখে আমি দিতে পারব না।"

"আলবাত দেবে।" দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন বিপিনবাবু, "বেশী তেজ হয়েছে, না? হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? তিন টাকার খাবার, সে হুঁশ আছে? তোমার বাপের বাড়ী থেকে আসেনি মনে রেখো।"

স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে অমিতা। এ ব্যবহার তার কাছে নতুন নয়, কিন্তু প্রতিবারই বাপের বাড়ীর দৈন্যের উল্লেখে সে স্তম্ভিত না হয়ে পারে না।

"এ বুদ্ধি তোমাকে কে দিলে শুনি?" নিরুপায় হয়ে খাবারের ঠোঙাটি তুলতে তুলতে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল অমিতা।

"অন্তত তোমার থেকে তার বুদ্ধিটা কিছু বেশীই মনে হয়েছে।" ক্যান্‌ভাসের ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বললেন বিপিনবাবু।

"আচ্ছা কোন কথার ভাল উত্তর কি জীবনেও পাব না তোমার কাছ থেকে?"

"কেমন করে পাবে বল? আমি তো আর তোমাদের প্রগতিবাদী নব্য ছোকরা নই।"

বড় একটি নিঃশ্বাস ঠেলে বেরিয়ে এল অমিতার বুক থেকে। এ ইঙ্গিতের অর্থ সে বেশ ভালই বোঝে। প্রতিবাদ না করাই ভাল। আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। এখনও কিছু কর্তব্য বাকি আছে তার।

কিছুক্ষণ পরে একটি রেকাবিতে কিছু খাবার নিয়ে অমিতা ঘরে ঢুকল। খাবারটা টুলে রেখে জল গড়াতে গড়াতে বলে, "নাও খাও।" তারপর ভাল করে তাকিয়ে দেখে—বিপিনবাবুর কোলের ওপর একখানা আধখোলা বই, যে বইখানা অমিতা একটু আগে পড়ছিল।

খাবার দেখে বেশ একগাল হেসে তারিফ করে বিপিনবাবু বলেন, "নাঃ, তুমি দেখছি একটা কিছু না হয়েই ছাড়বে না। দেখো বাপু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের ভাতটুকু আর মেরো না।"

"মানে ?"

"কার বই এখানা ? কোলের ওপর থেকে বইখানা তুলে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে নিজের অনুমান জ্ঞাপন করেন তিনি, "বোধ করি তোমার সেই গুরুদেবের ?"

এসব ব্যাপারে তাঁর অনুমান গোয়েন্দা-সিরিজের নায়কের চাইতেও অভ্রান্ত। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে একটু ইতস্তত করে বেশ স্পষ্টভাবেই উত্তর দেয় অমিতা, "হ্যাঁ, নিখিলবাবুই দিয়েছেন।"

"সে তো নিশ্চয়ই, নাহলে আর এ হেন রত্ন আমদানি করবেন কে ?" বইখানি সশব্দে টুলের একপাশে রেখে দিয়ে বিপিনবাবু বলেন, "কিন্তু আমার বাড়িতে এসব প্রগতি-ট্রগতি চলবে না, এ আমি বলে দিলুম। হুঁঃ, প্রগতি! এ জন্যেই শালা বিদুষী বউ ঘরে আনে না বুদ্ধিমানেরা।" অতএব বুদ্ধিমানের উপযুক্ত পরিচয়ে ডান হাতের কাজ চালাতে লাগলেন

তিনি। আর খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে চলতে লাগল মন্তব্য, "তখনই জানি। অন্ত্যজ ঘরের মেয়ে আনতে নেই। সম্বন্ধই পাততে নেই। মান গেল, সম্ভ্রম গেল, ছেলেটারও যে কি শিক্ষা হবে—ছিঃ।" শেষ রসগোল্লাটি মুখে পুরে ঢক্ঢক্ করে একগ্লাস জল নিঃশেষ করে ফেল্লেন বিপিনবাবু।

চুপ করে থাকে অমিতা। মানসম্ভ্রম আর শিক্ষার ধারণাতেই যখন দুজনের আকাশ-পাতাল পার্থক্য তখন বাপের বাড়ীর মান-অপমান নিয়ে আর প্রতিবাদ করে লাভ কি? তাছাড়া পনেরো বছরের দাম্পত্যজীবনের টানাপোড়েনে সে আজ ক্লান্তও বটে।

কিন্তু ক্লান্তিহীন বিপিনবাবু। গেলাসে আঙুল ডুবিয়ে আলগোছে ঠোঁট মুছে হঠাৎ পিতৃকর্তব্যের বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন তিনি।

"ছেলেটা গেল কোথায়? তার জন্য কিছু রাখলে? না বললে তো আবার সে জ্ঞানটুকুও থাকে না। যে মায়ের ছব্বা।"

রীতিমত অবাক হয় অমিতা। ধীরে ধীরে বলে, "রেখেছি, যদিও না রাখাই উচিত ছিল। কিন্তু—" কথা না বাড়িয়েই প্রশ্ন করে অমিতা, "তোমায় একটা কথা বলব?"

"ও বাবা! এ যে একেবারে নভেলি ভূমিকা। যা বলবে চটপট বল। আমার সময় নেই। বেরোব।"

"এই সামান্য লোভটুকু ত্যাগ করতে পারলে না তুমি? পরের অনিষ্ট করে কি কখনও ভাল হয়? অন্যায়ের সায় দিয়ে যাওয়া তো আরও অন্যায়। বিশেষ করে দীপু রয়েছে, তার

কথাও তো ভাবতে হয়। এমনি করে এক দিনের লোভে কি ভবিষ্যৎ খোয়াবে তুমি ?"

"বলে যাও। বলে যাও। বক্তিমে তো ভালই হচ্ছিল। থামলে কেন ? হুঁঃ লোভটা আমারই হল বটে। ওষুধে জল মেশাচ্ছে তাতে আমার কি ? পুলিশ এল আর আমি অমনি তাদের গলা জড়িয়ে সব কথা ফাঁস করে দিই আর কি ? বলি কোম্পানীটা বন্ধ হলে খেতে কি ? ঘুষ ! কত্তা খুশি হয়ে কিছু দিলে তাকে ঘুষ বলে না, সেটা—সেটা বোনাস, বুঝলে বোনাস !" বেশ জুতসই একটা কৈফিয়ৎ দিতে পেরে নড়েচড়ে বসেন বিপিনবাবু, তারপর আবার বললেন, "লোভ ! লোভী ! জিজ্ঞেস করি তোমরা কি মুখে তালাচাবি এঁটে রাখবে ? পার তো আমার এই পাপের টাকাতে কেনা খাবারই তোমার গুরু-দেবের জন্যেও একটু ঘেন্না-ঘেন্না করে রেখে দিও !"

ইঙ্গিতটা নিখিলের প্রতি। অমিতার বাপের বাড়ীর পাড়ায় থাকত, তার ছেলেবেলার বন্ধু। "নিখিলবাবু তো আর আসে না।" ধীরে ধীরে উত্তর দিল অমিতা।

"তবে বইটা কি উড়ে এল ?" ঘাড় কাত করে প্রশ্ন করেন বিপিনবাবু।

সমিতির একটা মেয়ের হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন।

"ও বাবা, আবার সমিতি। বলি ন্যাতা-ট্যাতা কিছু করে স্বায়নি তো ?"

"সে ভাগ্য কি আমার ?" থালা-গেলাসগুলো তুলে নিতে

নিতে যথাসম্ভব শালীন্য বজায় রেখেই বলবার চেষ্টা করে অমিতা। যা তার জীবনের স্বপ্ন, যে জীবনাদর্শের কথা নিখিলের কাছে সে শুনেছে তাকে কি কোনদিনই সে জানতে পারবে? সে তো বন্দিনী। এক চাকাতেই বাঁধা তার জীবন। খাওয়ার পর রাঁধা। কি কাজ হবে তার দ্বারা? তার স্বপ্ন চিরদিন স্বপ্নই থেকে যাবে।—চিন্তায় বাধা পড়ে তার বিপিনবাবুর কথায়।

"যাই, সন্ধেটা আর তোমার সঙ্গে বসে বসে নষ্ট করব না। এতক্ষণে ওরা বোধহয় এসে গেছে।" হঠাৎ বেখাপ্পাভাবে উঠে আলনা থেকে জামা টেনে তাসের আড্ডার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন বিপিনবাবু।

ডালটা পুড়ে যায়নি তো? অমিতাও বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

একতলার তুটি ঘরে ওরা থাকে। উঠানের পাশে একফালি রোয়াকে রান্নার ব্যবস্থা। মাথার ওপর যে দরমার ছাউনি দেওয়া হয়েছিল, তার প্রায় সবটাই লোপাট হয়ে গেছে বহুকাল আগে। তাই বেলা থাকতেই রান্না চাপিয়ে দেয় অমিতা।

ডাল সাঁতলানো শেষ করে ভাত চাপাতে চাপাতে মনটা অনেক হাল্কা হয়ে আসে তার। কি লাভ অযথা মন-খারাপ করে? 'ছায়ার সাথে কুস্তি'—সত্যি কথাই লিখেছে দীপুর বইখানাতে। বইয়ের কথা মনে হওয়ায় ভাত চাপিয়ে ঘরে ফিরে এসে বিপিন-বাবুর ফেলে-দেওয়া বইখানা টুল থেকে আবার তুলে নেয় অমিতা। বেশ লাগছে। যত পড়ছে, ততই ভাল লাগছে তার।

"মা জানো, আমায় ক্লাবের ক্যাপ্টেন করে দিয়েছে!" একটু পরেই চীৎকার করতে করতে ঢুকলো দীপক। তার বগলে ফুটবল, চোখ মুখ খুশিতে ভাসছে। বই থেকে চোখ তুলে হাসল অমিতা। তারপর তাকে কাছে বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অনুযোগ করে, "কিন্তু দীপু, দেরি দেখে তোমার বাবা কত রাগ করছিলেন। এত দেরি করে ফেরে কি ছোট ছেলেরা? এত দেরি কোরো না বাবা।"

"আচ্ছা মামণি।" কাদামাখা হাতে মার গলা জড়িয়ে ধরে প্রবলবেগে মাথা নাড়ে সে।—"কিন্তু এখন তো মোটে সাড়ে ছটা।"

"তুমি বুঝি রাগ করেছ মামণি?" আরও জোরে সে মার গলা জড়িয়ে ধরে।

"না রে পাগলা। আচ্ছা ছাড় দেখি আমায়। তোর খাবার দিই।" হাসিমুখে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় অমিতা।

খাবার খেতে খেতে অসীম উৎসাহে বলে চলে দীপক তার কৃতিত্বের কথা। জিজ্ঞেস করে, "হ্যাঁ মা, নিখিলমামা জানে যে আমি এমনি ভাল খেলতে পারি?"

"জানেন বৈকি রে। কত প্রশংসা করেন তিনি আমার কাছে।" ভাতের ফেন গালতে গালতে উত্তর দেয় অমিতা।

"নিখিলমামা আর আসেন না কেন মা?"

কি উত্তর দেবে অমিতা? নিজেকে আর প্রবঞ্চনা করতে ইচ্ছে হয় না, তবু বলে, "কাজে আটকা পড়েছেন বোধহয়।"

"তা কেন? আমাদের রাস্তা দিয়ে তো প্রায়ই যান।"

"তাই নাকি? তা হবে।" উনুনে তরকারির কড়া চাপিয়ে কথাটার ছেদ টানতে চায় অমিতা। কিন্তু দীপক যেন সদ্য পদপ্রাপ্তির আনন্দে ঘুরে ঘুরে নিখিলের কথাই জিজ্ঞেস করে আজ। নিখিল যে তার বড় আপন। দিন দিন সস্নেহ ব্যবহারে কাছে টেনেছে তাকে নিখিল। তার বাবার রূঢ় স্নেহহীন ব্যবহারের তুলনায় সে যেন সস্নেহ নীড় খুঁজে পায় মা ছাড়া একমাত্র নিখিলমামারই কাছে। বাবার থেকেও তাই সে বেশী ভালবাসে নিখিলমামাকে। একথা সে বারবার প্রকাশ করতে ছাড়ে না। কত বই পড়তে দিয়েছেন তাকে নিখিলমামা। কত দেশ-বিদেশের কথা শুনিয়েছেন তাকে। ভারী ভাল ভাল গল্প বলতে পারেন নিখিলমামা। মার সঙ্গেও কি সুন্দর ব্যবহার করেন তিনি। বাবার মতো রাতদিন দাঁত খিঁচিয়ে কথা বলেন না।

"বিচ্ছিরি লাগে বাবাকে আমার।" হঠাৎ বলে ওঠে দীপক।

"ছিঃ দীপু, বাবা হন না।"

"তা হলেই বা। বাবা কেন তোমাকে শুধু শুধু বকে? নিখিলমামা কত ভাল, তবু নিখিলমামাকেও বাবা ভালবাসে না।"

"হ্যাঁ তুই ভারী জানিস কিনা।" হেসে ফেলে অমিতা।

"জানিই তো।" প্রতিবাদ করে দীপক।

"তা হোক দীপু।" বাধা দেয় অমিতা।

"না মা। বাবা নিশ্চয়ই বিচ্ছিরি। নিখিলমামা যখন আগে আসত, তখন বাবা রোজ আমাকে জিজ্ঞেস করত, কি কথা বলে তোমাকে? আমি কিন্তু কিছু বলিনি মা। তুমি যে নিখিল-মামার কাছে পড় তাও বলিনি। আমি খুব চালাক, না মা?"

চুপ করে থাকে অমিতা। নিখিলকে নিয়ে স্বামীর এই মিথ্যা সন্দেহ সব সীমাই ছাড়িয়েছে। সৌজন্য-জ্ঞান তো নেই-ই, সৎসাহসও নেই যে স্পষ্ট করে নিখিলের সামনে কিছু বলেন। সমস্ত রাগ তাই সুদে-আসলে মিটিয়ে নেন অমিতার ওপর। তাইতো নিজেই একদিন বারণ করে দিয়েছিল অমিতা নিখিলকে, "তুমি আর এ বাড়ীতে এসো না। শেষে কি একটা কেলেঙ্কারি হবে?" গলায় তার রীতিমত ভয়ের আভাস ছিল।

"তুমি বলো তো আর আসব না। কিন্তু কেন?"

"ওঁকে তো চেন!"

"বুঝলাম।" বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলেছিল নিখিল, "কিন্তু তোমার ওপর ছোটবেলা থেকে কত জোর খাটিয়েছি আমি। আর আজ যখন নিজে সত্যিকারের একটা পথ পেলাম, তোমার কোন কাজেই লাগতে পারব না ভেবে দুঃখ পাই। উন্মুখ মন নিয়েও সমাজের কোন সেবা তোমার দ্বারা হবে না। কি অসহায় অবস্থা বল তো!"

"তোমার জোর তোমারই আছে। জানি না একদিন এ অবস্থার অবসান হবে কিনা। কিন্তু সমাজের জীব তো আমরা। স্বামীর অমতে কোন কাজ করা কি সম্ভব?"

"হয় তো সম্ভব, হয় তো নয়—যে যেমন মনে করে। যাক সে কথা।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল নিখিল, "কিন্তু নিজেকে তুমি পরাজিত হতে দিও না অমিতা। আমি আসি বা না-আসি তাতে কিছু আসে যায় না। তোমার মধ্যে যে সংকল্প দেখেছি তা যেন নিভে না যায়, মনে রেখো দীপুর ভার তোমার ওপর। ও যেন সত্যিকারের মানুষ হয়।"

চোখে জল এসে যায় অমিতার, "ও যে আমার কত সাধের তা তুমি বুঝবে না নিখিল।"

"বুঝি অমিতা।" বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিখিল—"আর এও জানি আমার জন্যে দীপুকে অনেক অত্যাচারই সহ্য করতে হয়। সেই জন্যই তার কথা মনে হচ্ছে।" গলা ভারী হয়ে আসে নিখিলের, "আচ্ছা আমি যাই, কোন দরকার পড়লে আমায় খবর দিও।"

"দেব।"

"চলি। কয়েকটা দিন বড় দুঃখে কাটল তোমার।"

তারপর আরও কি বলতে গিয়ে হঠাৎ মোড়া থেকে উঠে পড়েছিল। প্রশান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে অমিতার নীচু-করা মুখের দিকে একবার দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়েছিল।

সে আজ কতদিন।

মাস কয়েক পরের কথা।

শীতের ভোরে অনিচ্ছুক শরীর আর মনকে লেপের তলা থেকে যেন টেনে বার করতে হয়। পাশেই দীপক ঘুমুচ্ছে। ও পাশের তক্তপোশে আকণ্ঠ লেপ জড়িয়ে ঘুমুচ্ছেন বিপিনবাবু। মাথার দিকের জানলাটা বন্ধ করে দীপকের গায়ে লেপটা ভাল করে টেনে দেয় অমিতা। তারপর শাড়ীটা গুছিয়ে নেয়।

আজ বেশ শীত পড়েছে, মনে মনে ভাবে আর নীচু গলায় উচ্চারণও করে। কদিন থেকেই একথা বলছে সে। কে জানে এতে শীতজয়ের গরিমাটুকু বেড়ে যায় কিনা।

উনুনে আঁচ দিয়ে কড়া নাড়ার শব্দে খিড়কি দরজা খুলতে যায় সে। বাসন-মাজার ঝি এল বোধহয়।

"বড্ড বেশী দেরি করেছ।" দরজাটা খুলতে খুলতে বলে অমিতা।

"বিশেষ দেরি হয়েছে কি? এখনও তো ভাল করে ভোরই হয়নি।" হাসতে হাসতে বলে নিখিল।

"একি তুমি!" আচমকা কয়েক পা পিছিয়ে যায় অমিতা।

"হ্যাঁ আমিই। একটা জরুরী কথা আছে। তোমার অনুরোধটা আর রাখতে পারলাম না তাই এসে পড়লাম।"

পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল অমিতা। নিখিলের হাসিকে হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে পারল না। হঠাৎ যদি বিপিনবাবু এসে পড়েন। মনে তার যেন কাঁটা দিয়ে উঠল।

নিখিলই কথা শুরু করল, "আজ সাতটার ট্রেনে বাড়ী যেতে হচ্ছে। বাবার খুব অসুখ।"

"তোমার জামাগুলো সেলাই হয়ে থাকলে অপর্ণার হাতে দিয়ে দিও, পার তো আরও কয়েকটা সেলাই করো। দক্ষিণের বস্তির বাচ্চাগুলো শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছে। কাপড় অপর্ণাই দেবে। আর বইপত্র যা দরকার দীপুকে দিয়ে নরেনের কাছ থেকে আনিয়ে নিও। কিন্তু—" একটু থেমে বলে, "অসুবিধে হচ্ছে মেয়েদের কেন্দ্রটি নিয়ে।"

"কী অসুবিধে?" এতক্ষণে জড়তা কাটে অমিতার।

"গৌরীর বাবা আর ওকে পড়াতে যেতে দেবেন না। তুমি এর পরিপূর্ণ ভার নাও অমিতা।"

"কিন্তু আমার পক্ষে বাড়ীর বাইরে গিয়ে পড়ানো তো সম্ভব হবে না।"

"বেশ, তোমার বাড়ীতেই কর তাহলে, সপ্তাহে তিনদিন সেলাই আর তিনদিন লেখাপড়া। সে তিনদিন তোমার এখানেই তো হতে পারে।"

"কখন? দুপুর বেলাতেই তো?"

"হ্যাঁ। বেলা দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত। কথা দাও অমিতা। নাহলে আমি জানি ফিরে এসে দেখব কেন্দ্রটি ভেঙে গেছে। কিন্তু তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে।"

বিশ্বাস আছে তার ওপর? সে পারবে এতগুলো নীচুতলার মানুষকে খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে সাহায্য করতে? কেমন

উন্মুখ হয়ে ওঠে অমিতার মন। বলে, "আচ্ছা। কিন্তু তুমি কবে ফিরবে?"

"বুঝতে পারছি না। দেরিও হতে পারে। তবে এর মধ্যেও ফিরতে পারি। সবই নির্ভর করছে ওখানকার অবস্থার ওপর।"

অমিতা চুপ করেই থাকে। নিজের থেকে জিজ্ঞাসা করা ওর স্বভাবের মধ্যে নেই।

"হ্যাঁ, দীপু কোথায়?" অন্য কথা পাড়ে নিখিল।

"ঘুমুচ্ছে, ডাকব?"

"থাক, বেচারাকে কষ্ট দিয়ে আর কাজ নেই। কতদিন যে আদর করিনি ওটাকে। আচ্ছা আজ চলি, কেমন?"

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে অমিতা। তারপর যতক্ষণ দেখা যায় দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। যে দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে পড়তে পারে বাইরের জগতের মাঝখানে, অথচ সারাজীবনই যে মুহূর্তটির জন্য প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে, সেই দরজা। ভেতরটা বারান্দায় আঁচ-ওঠা উনুনের মত গনগনে হয়ে ওঠে।

আঁচ বয়ে যায়।

ঘণ্টা তিনেক বাদে বিপিনবাবুর অফিস যাবার সময় আর-একপসলা বর্ষণ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য এক তরফা।

নিখিলকে অমিতা কথা দিয়েছে আজ থেকে পরিপূর্ণ ভার নেবে ও কেন্দ্রটির। কিন্তু বিপিনবাবুর সম্মতি ছাড়া যে কোন-মতেই তা সম্ভব নয় সে কথা বেশ ভালভাবেই জানে অমিতা।

কিন্তু কথাটা পাড়তেই যেন ঠিকরে উঠলেন বিপিনবাবু। অবশেষে গালিগালাজ এবং রীতিমত শাসানির পর তাঁর নাটকীয় প্রস্থান ঘটল।

দীপুর আজ ইস্কুলে যাবার তাড়া নেই, গা-টা যেন ছ্যাকছ্যাক করছে। পাশের ঘরে বসে বসে বই পড়ছে গল্পের। হঠাৎ যেন মায়া লাগল অমিতার নতুন করে স্বামী আর সংসারটার জন্য। সত্যিই স্বামী যেন তার এক রকমের! তিনি তাকে একটি সস্তা দরের আসবাব ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না— এ কথা সে জানে। আর বারো বছরের দাম্পত্যজীবনের প্রথম বছর ছাড়া ভাল ব্যবহারও যে একদিনের জন্যও সে পেয়েছে তাও মনে করতে পারে না অমিতা। তিনি তার সংসারেরই অন্য আধখানা, তবু তিনি দীপুর বাবা, একথাও ভোলা যায় না। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর এই দ্বন্দ্বে ক্ষতি দীপুরই সব থেকে বেশী, সে যদি তার বাবাকে না ভালবাসতে পারে, চরিত্রগঠনেও তবে তার ফাঁক থেকে যাবে এটা অমিতা ভালভাবেই জানে। কিন্তু অমিতা কী করবে? কোনদিনই সে কঠিন কথা বলে না। আঘাত আসে আচমকা। সে শুধু আত্মরক্ষা করে, নিজেকে টিকিয়ে রাখতে চায়। নিজেকে আর নিজের মনকে, মনের আদর্শকে। তার চরিত্রে কোথায় যেন একটা জোর আছে, নানা প্রতিকূল অবস্থায় যা চিরকাল চায় স্বাধিকারের প্রতিষ্ঠা। স্বভাব বদলাবে সে কী করে!

দুটো বাজবার আগে থেকেই মেয়েরা এসে গেল, অপর্ণাই

তাদের নিয়ে এল। শোবার ঘরের পাশেই যে ঢাকা ফালিটুকু সেখানে তারা বসে পড়েছে ততক্ষণে।

"কই অমিতাদি!" অপর্ণা ডাক দেয়, "মেয়েরা এসে গেল। দুজন শুধু আসতে পারল না, একজনের ছেলের অসুখ, অন্য-জনের স্বামী আসতে দিল না।"

"ময়নার সোয়ামিটো যেন ষণ্ডামার্কা গো!" একজন মেয়ে মন্তব্য করে, "আমার ঘরের নোকের তো কতই ইচ্ছে। তবে হ্যাঁ বাপু, ছেলে রাখতে পারবেনি, আগে থেকেই বলে দিয়েছে। তাইতো ছেলেটাকে টেনে নে এসতে হলো।"

"তা হোক, তবু তোমরা হাল ছেড় না।" অপর্ণা তাদের বোঝায়, "আজ না হোক কাল স্বামীরা বুঝতে পারবে যে তোমরা লেখাপড়া শিখলে তাদেরই ভালো। তোমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে মানুষ হয় সে কথা তো ভাবতে হবে।"

অমিতা এ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শুনতে পায়। '—আজ না হোক কাল স্বামীরা বুঝবে—'

সত্যি সেই আশাতে ও-ও যে দিন গুণছে। কিন্তু সে কাল কবে?

"ঐ মাদুরটা পেতে বসো না ভাই তোমরা। মেঝেতে কেন?" মাদুরটা কোণ থেকে নিয়ে পেতে দিল অমিতা।

"আজ বেশিক্ষণ বসতে পারব নি।" রেবতী বলে, "আমরা তো তোমাদের মত স্বাধীন নই গো দিদিমণি। আমার সোয়ামী তো এসতেই দিতে চায়নি। কত কষ্টে যে এসেছি!"

স্বাধীনই বটে। অমিতা মনে মনে হাসে। মুখে বলল, “তোমরা তো লেখাপড়া শেখ অপর্ণাদিদির কাছে। আমি তোমাদের সেলাই শেখাব। আর তাছাড়া রোজ আমরা খবরের কাগজ পড়বো। কি বল?”

“সে তুমি ভাল জান দিদি।” বয়স্কা একটি বৌ উত্তর দেয়, “তবে আমায় বাপু এমন করে শিখিয়ে দাও যেন রামায়ণটা অন্তত নিজে পড়তে পারি। নিজে চিঠিখানাও নিখতে পারি।”

“পারবে বৈকি! এই তিনদিন অমিতাদি তোমাদের সেলাই শেখাবেন। আমি পড়াব বাকি তিনদিন।” অপর্ণা তাদের উৎসাহ দেয়।

“অ! হ্যাঁ গা দিদি—তোমার শোবার ঘরে আমাদের বসালে, তোমার কত্তা কিছু বলবে নি?”

“না। এ তো ভাল কাজ। উনি বলবেন কেন?” অমিতা বসে পড়ে মাতুরের একপাশে। শোন। আজ তোমরা সেলাইয়ের জন্য ছুঁচ-সুতো কিছু এনেছ? তোমাদের আসন-বোনা শেখাব। এর জন্য খানিকটা চট···”

দরজায় অসময়ে কড়া নাড়ার শব্দ হল। অমিতা ওঠবার উপক্রম করতেই অপর্ণা বলল, “অমিতাদি আমি দরজা খুলে দিচ্ছি। তুমি কাজ কর।”

দরজা দিয়ে ঢুকলেন বিপিনবাবু। হাতে একটি নাতি-বৃহৎ বোঁচকা। ফুলকপির মাথা দেখা যাচ্ছে। দরজা দিয়ে ঢুকেই অপাঙ্গে একবার তিনি দেখে নিলেন অপর্ণাকে। একপাশে

সরে দাঁড়িয়ে অপর্ণা হেসে বলল, "আজ আপনার বাড়ী চড়াও করেছি। সব ঘর বেদখল।"

"হুঁ।" গম্ভীরভাবে পাশ কাটিয়ে ঢুকলেন বিপিনবাবু। আবার সেই বস্তিঘোরা মেয়েটা! শোবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে গেলেন।

অমিতা ততক্ষণে বুঝেছে ব্যাপারটা। স্বপ্নের অগোচর বিপিনবাবুর এই আকস্মিক আবির্ভাব! সে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। এমন অসময়ে? আর কিনা আজই! বিপিন-বাবুর স্বভাব তার অজানা নয়, কিছুক্ষণ আগে মায়া-করা লোক-টার জন্য সে ভয় আর বিতৃষ্ণা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করতে পারল না।

"এদিকে শোন।" ঘরে যেতে যেতে চাপাগলায় অমিতাকে ডাকলেন বিপিনবাবু।

"যাচ্ছি।" সময় নেবার চেষ্টা করে অমিতা।

"যাচ্ছি নয়, এখনি এসো।" শোবার ঘর থেকে ক্রুদ্ধ আওয়াজ আসে।

"তোমরা বসো ভাই। আমি আসছি।"

ঘরে ঢুকতে গিয়ে একটু দাঁড়ায় অমিতা। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে ধরে। তারপর সোজা ঘরের মাঝখানে গিয়ে হাজির হয়।

সঙ্গে সঙ্গেই উঁচু গলায় বলে ওঠেন বিপিনবাবু, "বলি ব্যাপার কি? স্বাধীন জেনানা নাকি?—একেবারে বাড়ীর ভেতর!"

"আস্তে বল, আস্তে। তোমার পায়ে পড়ি—"

"কিসের আস্তে? ভয়টা কাকে? ঐ মাগীগুলোকে নাকি?"

"দোহাই তোমার। আমি তো ভাবিনি তুমি এ সময়ে ফিরবে।"

"তা তো ভাববেই না। পতিচিন্তায় বিভোর হলে যে প্রগতি হবে না, সেকেলে হয়ে পড়বে। তা আয়ান ঘোষ ঘরে নেই, কেষ্ট ঠাকুরের আসতে বিলম্ব কেন?"

"ছিঃ!" আকণ্ঠ ঘৃণায় মুখ বিকৃত করল অমিতা।

"কিসের ছিঃ!—নভেলিআনা না?—আবার ছিঃ—কোনটা বাকি রেখেছ শুনি। ও মাগীগুলোকে আমি চিনি না নাকি? ঢুকিয়েছ কেন ওদের এ বাড়ীতে? কার হুকুমে?"

"হুকুম আবার কিসের? নিজের সংসারে দুটো ভাল কাজ করতে পারব না?"

"ভাল কাজ!" তার সুর নকল করে খিঁচিয়ে উঠলেন বিপিনবাবু, "কতকগুলো বাজারে-মাগীর হট্টগোল ভাল কাজ? বলি এটা ভদ্রলোকের বাড়ী নয়?" গলা তখন সপ্তমে চড়েছে।

"এখন তোমাকে দেখে তা মনে হচ্ছে না।"—চাপা অথচ জোর গলায় বলে অমিতা।

"কি? এত বড় আস্পদ্দা! মুখে মুখে জবাব?"

এই সময়েই দীপু ঢুকল ঘরে। পাশের বাড়ীতে গিয়েছিল একটা গল্পের বই আনতে।

"এই যে শুয়ার। কোথায় যাওয়া হয়েছিল?" ছেলের

মাথার চুল ধরে কাছে টানলেন তিনি।

"পাশের বাড়ী।" প্রায় আর্তনাদ করে উঠল দীপু।

"ইস্কুল নেই? আমি শালা মাস মাস টাকা গুনব আর তোমরা মায়ে-পোয়ে ফুর্ত্তি মারবে। দাঁড়াও।"

"কি করছ?" এগিয়ে আসে অমিতা, "জ্বরভাব বলে আমিই ইস্কুলে যেতে দিই নি।"

"সরে যা হারামজাদী। আমার বাড়ীতে যা ইচ্ছে তা চলবে না।" চড় পড়ল দীপুর পিঠে।

"আমার ওপর রাগ করে ছেলেটাকে মেরে ফেলবে নাকি? ছেড়ে দাও।"

ছাড়াবার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে একটা চড় এসে পড়ে তার হাতে। আর প্রবল বেগে মারতে থাকেন বিপিনবাবু দীপুকে।

"ছাখ, অনেক সহ্য করেছি, আর নয়।"—দৃঢ় গলায় বলে এগিয়ে আসে অমিতা। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রচণ্ড ধাক্কায় পড়ে যায় সে মেঝের ওপর। জলচৌকির কোণে লেগে তার কপাল ফেটে যায়। রক্ত ঝরতে থাকে।

"মামণি।" নিজের ব্যথা ভুলে মাকে জড়িয়ে ধরে দীপক। আর অসহ্য মানসিক উত্তেজনায় ফাটা কপাল চেপে ধরে জ্ঞান হারাবার আগে অমিতা দেখতে পায়—ছেলের ব্যাকুল মুখ, আর অপর্ণা আর ঐ মেয়েগুলির মুখ···রেবতী, পাঁচুর মা, কুসুম··

অমিতার চারিদিকে ওরা ঘিরে দাঁড়ায়।

ছোটবেলা থেকেই সুপর্ণার এ বিষয়ে নামডাক ছিল। আর সেইজন্মই বীরেশের মত অমন জাঁদরেল চাকুরের সঙ্গে বিয়েটাও তার সহজেই হয়ে গেল।

বীরেশ চেয়েছিল রূপ আর বলিয়ে-কইয়ে বৌ। আর সুপর্ণার ভেতর নাকি এ হুটোরই এত প্রাচুর্য যে এ বিষয়ে আর হুবার ভাববার কথা মনে হয়নি বীরেশের। তাই প্রথম প্রস্তাবেই মত দিয়ে বসেছিল সে।

সুপর্ণার রূপ আছে, বিত্তে খুব না থাক তার জৌলুষ আছে, আর আছে লোককে মুগ্ধ করার ক্ষমতা। সে না হলে নাকি কিছুই জমে না। বন্ধুদের বাড়ী বা কোন উৎসবে তাকে চাই-ই। এ জন্ম বান্ধবীদের ঈর্ষা তো হ'তই, তারা বলতেও ছাড়ত না।

"কি পায় ওর ভেতর সকলে? খালি রূপ আর কথার ঝুড়ি।"

"ঠিক বলেছিস।" আর কেউ সায় দিত, "সেদিন মনীষার অমন গান, তা অবধি ভাল করে শুনতে পেলাম না। কি না সুপর্ণা এসেছে। সব কটি মাথা অননি ওদিকেই ঘুরে গেল।"

"হিপনটিজম্ জানে বোধ হয়।"

সত্যি জানে নাকি? সুপর্ণার হাসি পায়। আর এ শক্তির পরখ করতে গিয়ে সে যা করল, সেটাই তার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে

গেল। বিয়ে করার সময় বীরেশ তাও কিছু কিছু জানত। অনেকের কাছেই এ বিষয়ে ইঙ্গিত পেয়েছে। কিন্তু তার মতে এটা তো একটা আর্ট, পরকে আকর্ষণ করা। অবশ্য একেই ন্যাকি ওর বান্ধবীরা বলত খেলা। পুরুষ নিয়ে খেলা।

হ্যাঁ সুপর্ণার এটা একটা অভ্যাসই ছিল। বেশী কিছু নয়। একটু প্রশ্রয় দেওয়া, তাদের স্তুতিবাদ কান পেতে শোনা, দু'একবার তাদের সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া ; কিন্তু আর নয়। তাদের মধ্যে কেউ গঙ্গার ধারে 'মুনলিট' পিক্‌নিকে নির্জনতম মুহূর্ত খুঁজতে গেলেই ছেদ পড়ত অন্তরঙ্গতায়। তবু আবার! আবার এ খেলায় আনন্দ পেত সুপর্ণা। দু-একজন বান্ধবী চাইত, ও একবার মরুক।

"তেমন ছেলের পাল্লায় পড়লে সুপর্ণার এই খেলা আর ন্যাকামো বেরিয়ে যাবে। যত সব হাঁদা। হাঁ করে ওর রূপ গেলে, আর মরে।" বলেছিল প্রীতি, সুপর্ণারই এক নিকটতম বান্ধবীর কাছে।

"তা কেন? এতে খারাপ কি আছে? ওর মত রূপ আর চার্ম থাকলে তোরাও কি কোন এ্যাডভানটেজ নিতিস না?" ঝর্ণা জবাব দিয়েছিল।

"জানি না বাবা। রূপ থাকলেই একস্‌প্লয়েট করতে হবে এ মনে করি না। পুরুষগুলোর সঙ্গে এভাবে মেশামেশি করলে চরিত্র নষ্ট হয় না?"

"চরিত্র?" হেসেছিল ঝর্ণা, "ভাই আমরা যারা চরিত্র নষ্ট

করবার সুযোগই পেলাম না, এমনি চেহারা, তারা আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাব কেন বল ? ও সব সুপর্ণাকেই মানায়।"

এ সব যুক্তি অবশ্যই মনে লাগেনি বান্ধবীদের। তারা সমালোচনার হাল ছাড়েনি। কিন্তু যাকে নিয়ে এত আলোচনা সে নির্বিকার। আর তার জন্য ছেলেরা পাগল।

বীরেশের সঙ্গে বিয়েতেও সুপর্ণার মত ছিল না। "আর কিছুদিন পরে মা ! আমার এম. এ হয়ে যাক।"

"কোন দরকার নেই। এমন পাত্র আমি হাতছাড়া করতে পারব না। অতবড় চাকরি, অমন চেহারা, কত ভাগ্য করলে তবে পায়।"

"সব মানছি। কিন্তু বিয়ে মানেই তো সব শেষ।"

"শেষ !" মা অবাক হয়েছিলেন। "কিসের শেষ ?"

"মানে এই স্বাধীনতার।" সুপর্ণাকে দু একটা ঢোক গিলতে হয়েছিল বৈকি।

"সুপর্ণা ! বাড়াবাড়ি করিসনি।" মা প্রায় ধমক দিয়েছিলেন, "তোরা যা স্বাধীনতা পেয়েছিস আমরা তা ভাবতেও পারিনি কোনদিন। আরও চাস ?"

"মা তোমাদের সময় যে গেছে।"—মাকে জড়িয়ে ধরেছিল সুপর্ণা।

"সে তো গেছেই। তা' বলে ও সব আমি শুনব না। সামনের বোশেখে বাপু তোমার বিয়ে আমি দেবই। এবারই দিনস্থির করব। স্বাধীনতা না ছাই—উচ্ছৃঙ্খলতা।"—মা গজ

গল্প করেন।

বিয়ের পর বীরেশের কর্মস্থল ধানবাদে স্থপর্ণাকে আসতে হ'ল বীরেশের সঙ্গে। স্থপর্ণার সঙ্গে কয়েকদিন ঘর করেই বীরেশ বুঝতে পারল, অন্য কেউ নয়, তার জীবনে স্থপর্ণাকেই প্রয়োজন। যা হোক মানানসই বৌ পেলে তার মত অফিসারের কোনমতেই চলত না, ভবিষ্যতও খুব উজ্জ্বল হ'ত না এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কয়লা খনির অফিসার বীরেশ যেন হীরের সন্ধান পেল। স্থপর্ণার রূপ আর গুণের খনিতে হীরের লোভে সে এগিয়ে গেল অনেকদূর। তার আশপাশের ওপরওয়ালাদের চোখ ঝুটো কাঁচের ঝক্‌মকানিতেই যে কী আন্দাজ ঝলসে ওঠে, তার কিছু কিছু বীরেশের ভালই জানা ছিল।

"বিকেলের দিকে লাল শাড়ীটা পর।" কোনদিন হয়ত বলত বীরেশ, "অফিসের দাস আসবে। হিরণ্ময় দাস। ওকে চায়ে বলেছি।"

তারপর চলত যতদূর সম্ভব স্থন্দর আর লোভনীয় সন্ধ্যার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করার সযত্ন প্রয়াস। মাঝে মাঝে স্ফুরিত ঠোঁটে সাদা ঝক্‌ঝকে দাঁত টিপে মিষ্টি করে হাসি, দু-একটা কৃত্রিম রাগ, বিস্ময় ও উৎকণ্ঠার প্রকাশ, আর অতিথিসেবার অভিনয়। সেবাটা অবশ্যই অভিনয়ে সীমাবদ্ধ থাকত না, তবে ব্যবহারে অভিনয়ের এনামেল থাকত।

এমনি করে কতদিন তো গেল। প্রায় তিন বছর। কত অফিসার বদলি হ'ল, আর তার সঙ্গে সাদা সবুজ লাল নীল, কত

রং-বেরঙের শাড়ী বদলে বদলে পরল সুপর্ণা। কত সন্ধ্যায় নিজেকে বিচিত্ররূপে উপস্থিত করল। বীরেশের ঘন ঘন পদোন্নতিতে তার সার্থকতার পরিমাপ বোঝা গেল।

এর মধ্যে কাউকে কাউকে বেশী একটু প্রশ্রয় দিত সে। তারা অবশ্যই বিশেষ শ্রেণীর। চাকরির জগতে যাঁদের বলা যেতে পারে ব্রহ্মা-বিষ্ণু জাতের। সুপর্ণার অভ্যস্ত খেলায় কোন কষ্ট হ'ত না। বরং এতেই সে বেঁচে থাকত। বিয়ের আগে যা শেষ হবে ভেবে ও ভয় পেয়েছিল তা যে সত্যিই শেষ হ'ল না, এতে সে আনন্দিতই হ'ল। আর-কোন দায়িত্ব না নিয়ে এভাবে রঙিন সন্ধ্যাগুলো কাটানোতে তার আপত্তি ছিল না মোটেও।

সেদিন সন্ধ্যায় যে দুজন তাদের বাড়ীতে চায়ে এলেন, তাঁরা হ'লেন এই বিশেষ শ্রেণীর। সেন আর মুখার্জি। এঁদের কথা বীরেশের কাছে আগেই শুনেছিল সুপর্ণা। এঁরা বাড়ীতে আসা নাকি গৃহস্বামীর রীতিমত সৌভাগ্য। সুতরাং এঁদের আগমনকে আবির্ভাব বলে মেনে নিতে সুপর্ণা দ্বিধা করল না, আর এই বিশেষ শ্রেণীর জন্য সেদিন বিশেষ ভাবে সজ্জিত হ'ল সে।

"সত্যি মজুমদার," মুখার্জি বললেন কোন এক সময়ে, "আপনার স্ত্রী-ভাগ্যে ঈর্ষা হয়।"

একবার আলগা করে দেখল সুপর্ণা তাঁকে, তারপর মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করল, "আপনাকে আর-একটু কফি দি?"

"দিন।" কাপটা বাড়িয়ে দিলেন মুখার্জি, "যদিও তিন কাপ হ'ল, তবু আপত্তি নেই আর এক কাপে।"

"আমাকেও দেবেন।" সেন যোগ দেয়।

"জানেন, ভাল মুক্তো চেনবার জন্য ভাল জহুরী দরকার। আমাদের মজুমদার যে এত বড় জহুরী কে জানত ?"

বীরেশ শুধু পাইপের ধোঁয়া ছাড়ে আর অল্প হাসে।

তবু মাঝে মাঝে বীরেশের দৃষ্টি সুপর্ণা এদিকে ফেরাতে ছাড়ত না।

"ছ্যাখ, তোমার মুখার্জিকে আমার বিশেষ ভাল লাগে না।"

"কেন প্রপোজ করেছিল নাকি ?"

"অতটা সাহস হবে ব'লে মনে ক'র না।" ঠোঁটের লাল রেখায় শেষ টান দিয়ে সূক্ষ্মতম করবার সময় বলে সে।

"তবে ?"

"বোকা বোকা ঢুলু ঢুলু তাকিয়ে প্রপোজ করার মত বোকা তোমার মুখার্জি নয়। ও যেন একটু ওভার স্মার্ট।

"সেজন্যই তো অতবড় পোষ্টটি বাগিয়েছে, তা ভুলো না।" বৌ-এর মাথায় একটা টোকা দিয়ে বলে বীরেশ।

"দিলে তো চুলটাকে খারাপ করে ?" আবার একটু চিরুনি চালিয়ে সুপর্ণা উঠে পড়ে। তারপর বীরেশের ঠিক বুকের কাছটাতে ঘন হয়ে দাঁড়ায়। তার গা থেকে ছড়িয়ে পড়ে মৃদু একটা সুবাস, যা বীরেশকে রীতিমত আবিষ্ট করে তোলে।

"আজ তোমায় সত্যিই লোভনীয় লাগছে।" বৌকে কাছে আকর্ষণ করে দীর্ঘ চুম্বন করে বীরেশ। রীতিমত অস্বস্তি বোধ করে সুপর্ণা। আবার ঠোঁটটাকে ঠিক করে নিতে হবে।

বাইরে হর্ণের শব্দ আসে। আর ঠোঁটের রং আবার লাগাতে লাগাতে বীরেশকে জানিয়ে দেয়, আজ সন্ধ্যায় সে মুখার্জির চায়ের পার্টিতে অতিথি।

সুপর্ণা ভাবতেও পারে না এই স্তাবকদের একজনও তার কথা ছাড়া অন্য চিন্তা করবে। এ বেশ মজা। এ খেলায় যেন ক্লান্তি নেই, একঘেঁয়েমি নেই। নিত্য নতুন বিচিত্র খেলা। মুখার্জি ব্যাচেলর, কিন্তু সেনের নাকি বৌ আছে। এ সম্বন্ধে অনেক গুজবও শোনা যায়। কিন্তু সুপর্ণা জানে ওর কাছে দুজনেই সমান।

সেবার যখন তাদের কথা হ'ল কোম্পানীর গাড়ীতে কাছেই তারা কোথাও বেড়াতে যাবে, তখন স্থানাভাবে মাথাওলা দুচার-জনের স্ত্রীরাও ফর্দ থেকে বাদ পড়লেন। কিন্তু বীরেশের স্ত্রীকে বাদ দিলে নাকি বাইরে যাওয়ার মানেই হয় না। সেন-মুখার্জির সমবেত আগ্রহে তাই সুপর্ণা চলল প্রধানদের সঙ্গে তাদের নির্দিষ্ট গাড়ীতে, আর সারাটা পথ ঠাসাঠাসি করে তাদের স্ত্রীরা অন্যগাড়ীতে জ্বলতে জ্বলতে গেল।

এমনি ভাবেই বেশ কাটছিল দিনগুলো। এমনি করেই যাক্ না। সুপর্ণাও তাই ভেবেছিল।

সেদিন সুপর্ণার মাথা ধরেছিল খুব। তাই প্রসাধনে সযত্ন প্রয়াস ছিল না। গেরুয়া রংএর শাড়ীর লাল পাড় ঘেঁষে তার সাদা পা দুটি সামনে রাখা মোড়ায় তুলে ভেতরের চওড়া বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছিল সুপর্ণা।

দু-একটা রুক্ষ চুল তার সাদা কপালে উড়ে এসে পড়ে তার মধ্যে একটি বিষণ্ণ মাধুর্যের সৃষ্টি করেছিল।

গাড়ী আসার শব্দ পাওয়া গেল। জুতোর আওয়াজ এগিয়ে এল বারান্দা পর্যন্ত। এখানেই আসবে নাকি ?

"মিসেস মজুমদার !" পরদার ওপাশে সেনের গলা শোনা গেল।

সুপর্ণা আনমনা ভাবটা বজায় রাখার চেষ্টা করে।

সেন এসে সামনের চেয়ারে একেবারে মুখোমুখি বসল।

"আপনি ? মজুমদারের আগেই—?"

"খুব জোর বৃষ্টি আসছে, তাই আগেই চলে এলাম।"

"ফিরবেন কি করে ? ওদিকের ভাঙা রাস্তাটায় যে জল জমে যাবে ?" সুপর্ণা বইটা রেখে নড়ে চড়ে বসে।

"ফিরব না।"—সেন উদাসভাবে উত্তর দেয়।

"বসুন, চায়ের কথা বলে আসি।"

"এখান থেকেই ডেকে বলুন। অদ্ভুত সন্ধ্যাটা আজ। তাই না ?"

আবার একটা গাড়ীর শব্দ। মুখার্জি নাকি ? কিন্তু না, বীরেশ ঢুকল পর্দা সরিয়ে।

"খুব ক্লান্ত আজ।" অস্ফুট স্বরে বলে বীরেশ, তারপর সেনকে দেখে বলে "আপনি কখন এলেন ?" মুহূর্ত আগের ক্লান্তিকে মুছে ফেলে আপ্যায়নের হাসিতে মুখ তার ভরে ওঠে।

"এখনি।"—ওর দিকে লক্ষ্য না দিয়েই উত্তর দেয় সেন।

তার চোখে বীরেশের প্রতি স্পষ্ট উপেক্ষা ফুটে ওঠে।

চা খাবার পর বীরেশ উঠে পড়ে।

"আচ্ছা আপনারা বসুন। আমি স্নান সেরে আসি।"

কতক্ষণ দেরি হয় বীরেশের। এর মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে আসে।

"আলোটা জ্বালা প্রয়োজন।" সুপর্ণা হঠাৎ বলে ওঠে।

"আলো থাক। চলুন না মিসেস মজুমদার একটু বেড়িয়ে আসি।"

"মজুমদার তো স্নানে, উনি আসুন!"

"আসুক না, আমরা হাঁটতে হাঁটতে এগোই। এত সুন্দর সন্ধ্যাটা আজ, বড় হাঁটতে ইচ্ছে করছে। আপত্তি আছে?"

"না আপত্তি কিসের? কিন্তু···" নিজের খোলা চুলের কথা মনে পড়ায় একটু ইতস্তত করে সুপর্ণা।

"মিসেস মজুমদার!" ভারী গলায় সেন ডাক দেয়। বোধ-হয় ওর ইতস্তত ভাবটা লক্ষ্য করে বলে, "একটা কথা বললে বোধহয় বিশ্বাস করবেন না!"

"কি এমন কথা?"

"আপনাকে আজ না সেজেই অদ্ভুত লাগছে। গেরুয়া শাড়ীতে আপনাকে এমন আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে সন্ন্যাসীর ভেক নিই।"

"তা মন্দ কি?" হেসে ওঠে সুপর্ণা।

"কিন্তু আপাততঃ সে ইচ্ছা স্থগিত রাখছি।" বলেই

কোটের বাটন-হোল থেকে রক্তের মত লাল গোলাপটা খুলে নিয়ে তুলে দেয় সুপর্ণার হাতে।

ধন্যবাদ জানিয়ে দীর্ঘ একটা ঘ্রাণ নেয় সুপর্ণা, তারপর সেটা সযত্নে পাশের ছোট নীচু টেবিলে রেখে দিয়ে কি মনে করে বলে, "একটু বসুন। আমি এখনই আসছি।"

স্নানের ঘরের কাছে গিয়ে দরজায় টোকা দেয় সুপর্ণা।

"এই শোন। তোমার দেরি হবে?"

"হ্যাঁ, কেন?" ওপাশ থেকে সাড়া আসে।

"সেন বলছে, একটু বেড়াতে যেতে।"

"যাও না!"

"আমার ভাল লাগছে না। তুমি তাড়াতাড়ি নাও। একসঙ্গে বেরোই।"

"না, আমার দেরি হবে। তুমি যাও না! কি আর হবে? সেনকে চটিও না।"

শুধু সেন কেন? কাউকেই চটানো অসম্ভব। সুপর্ণা সেকথা ভাল করেই জানে।

জায়গাটা এমনিতেই জনবিরল, তারপর সন্ধ্যায় মেঘ জমার আয়োজনে আরো নির্জন হয়ে এসেছে।

ওরা যখন বাড়ী ছাড়িয়ে খানিকটা দূর এগিয়েছে তখন বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে আরম্ভ করল।

"কি হবে? ভিজে যাব যে!" হাওয়ায় ওড়া চুলগুলো মুখের থেকে সরাতে সরাতে সুপর্ণা বলে।

"ভিজবেন কেন? আমার বর্ষাতিটা নিন।"

"আর আপনি?"

"আমার প্রয়োজন নেই।"

"দরকার নেই। চলুন তাড়াতাড়ি ফেরা যাক।" ততক্ষণে বৃষ্টি এসে গেছে। হাওয়ার বেগও বেড়েছে।

"ছুটে গেলেও ভিজে যাব। নিন বর্ষাতিটা গায়ে দিন। আচ্ছা দুজনেই গায়ে দিই আসুন।"

"সে কি?" চলতে চলতেই সুপর্ণা বলে, "থাক দরকার নেই। আমার ভিজলে কিছু হবে না।"

"তা হয় না।" বর্ষাতির একপ্রান্ত ওর গায়ে দিয়ে দেয় সেন। তারপর বলে, "অস্বস্তি বোধ করছেন নাকি?"

"না অস্বস্তি বোধ করব কেন?" সহজ হবার চেষ্টা করে সুপর্ণা।

"একটা বর্ষাতিতে দুজনের ঠিক হয় না, সরে আসুন।" ওকে কাছে টানে সেন।

"তাড়াতাড়ি পা চালান।" সুপর্ণা না বোঝার ভান করে। সে কি এতদিন বাদে খেলায় ভয় পেল?

"মিসেস মজুমদার!" সেন প্রায় কানের কাছে মুখ এনে বলে, "আপনাকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে করছে।"

"এত বৃষ্টির ভেতরেও আগুন? নিভে যাবে যে?" শূন্য গলায় জোরে হেসে ওঠে সুপর্ণা।

"ভেতরের আগুন যে। বাইরের ছাঁটে কিছু হবে না।" বলেই হঠাৎ শক্ত করে তাকে জড়িয়ে ধ'রে সেন তার জলে ভেজা কাঁপা ঠোঁটে চুম্বন করে।

"ছাড়ুন।" আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় সুপর্ণা।

"ছাড়ব বলেই কি আজ এসেছি?"

"তার মানে?"

"মানে তো বুঝতেই পারছেন।" তারপর সুপর্ণার ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া হাত মুঠির মধ্যে চেপে ধরে সে আবার বলে, "আপনি আমাকে পাগল করে দিয়েছেন মিসেস মজুমদার। আজ সারাদিন কাজে মন দিতে পারিনি। কেবল আপনার কথা ভেবেছি।"

"বাড়ীতে বসে ভাববেন চলুন।" নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নেয় সুপর্ণা। এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু আঁচল ধরে আবার কাছে টেনে আনে সেন। বৃষ্টি আর অন্ধকারে মিশে রাস্তা যেন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

"মিষ্টার সেন!" গর্জে ওঠে সুপর্ণা, "মনে রাখবেন আপনি একজন ভদ্রমহিলার অপমান করছেন।"

"অপমান?" হা হা করে হেসে ওঠে সেন। "আপনাদের মত মেয়ের আবার অপমান কি? ন্যাকামি রাখুন। চলুন—" জোর করে সুপর্ণাকে জড়িয়ে ধরে সে আবার বলে, "মজুমদারকে একটা লিফ্‌ট দিলেই তো..."

চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু অপমানের

আগুনে তা যেন নিঃশেষে শুষে নেয়। চোখ ছুটো করকর করে। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় সুপর্ণা। তারপর এক রকম ছুটতে ছুটতে এগিয়ে যায় অন্ধকারে।

পনের দিনের মধ্যে বীরেশের নিজের চেষ্টায় বদলির খবরে সকলেই অবাক হ'ল। যেদিন সুপর্ণারা রওনা হয়ে গেল সেদিনই বিকেলবেলা বেয়ারার হাতে সেন পেল একখানা মুখ আঁটা খাম।

খুলে দেখল চিঠি নেই, শুধু একটি শুকনো লাল গোলাপ।

অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। একটার পর একটা বাছল। তারপর রেখে দিয়ে ছোটগুলোর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল হরিপদ, "এগুলো কত করে?"

ফলওয়ালা ততক্ষণে খদ্দেরের পকেটের খবর বুঝে নিয়েছে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল, "লাওনা বাবু এগুলোই। খুব সস্তা, টাকায় ষোলটা। ক' টাকার লেবে?"

"টাকায় কুড়িটা হবে না?" হরিপদ তবু আশা ছাড়ে না।

"নাঃ।" স্রেফ জবাব দিয়ে দিল ফলওয়ালা।

"তাহলে দুটো দাও।" পকেট থেকে পয়সা বার করল হরিপদ। তারপর পাশে অপেক্ষমান ছেলেকে বলল, "লেবু দুটো হাতে নে রে খোকা।"

খোকা এতক্ষণ চুপটি করে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথমেই বড় লেবুর দিকে আঙুল দেখিয়ে কেনার আবদার করে বাবার কাছে সে ধমক খেয়েছে। চোখ দুটি তার জলে ভরে গেছে। আর সে কোন কথা বলেনি। তাকিয়ে কেবল দেখেছে।

একজন মোটা মতন ভদ্রলোক মোটে দর করলেন না। কেমন বড় এক ঠোঙায় দু' টাকার কমলালেবু কিনলেন, আর ফলওয়ালা কত তাড়াতাড়ি সব থেকে বড় বড় লেবুগুলো তাঁকে বেছে বেছে দিল। আর হরিপদ কত বেছে দুটি লেবু নিল।

"এ দুটো লেবু কার কার বাবা ?" এতক্ষণে খোকা আবার জিজ্ঞেস করল।

"দুটোই তোমার মায়ের জন্য।" চলতে চলতে জবাব দিল হরিপদ।

"আমি একটা নেব বাবা ?"

"না খোকা, বেশী জ্বালিও না।"

"তবে আমি যাব না।" খোকা দাঁড়িয়ে পড়ল। "আমাকেও একটা দিতে হবে।"

"কি মুস্কিল করলে ! খোকা মার খাবে কিন্তু। আমার আর পয়সা নেই। কোথা থেকে পাব ? জান ত তোমার মার জন্য দুটোই দরকার।"

"তবে আমি একটা চেয়ে আনি। ফলওয়ালার তো কত আছে। যাই না বাবা।" বাবার হাত ছেড়ে দিল খোকা।

ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিল হরিপদ খোকার নরম তুল-তুলে গালে। "বদমাশ ছেলে। পথের মাঝে অসভ্যতা ? কারও কাছে চাইতে হয় ? হ্যাংলা বলবে না তাহলে।"

মার খেয়েও কাঁদল না খোকা। কেবল তার বড় বড় চোখ থেকে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

হরিপদ আবার খোকার হাত ধরে চলতে শুরু করল। ছেলেটাকে মেরে মনটা তার কেমন নরম হয়ে গেল।

সে ডাকল, "খোকা !"

খোকা সাড়া দিল না।

"খোকা, তুমি তো বাবা লক্ষ্মী ছেলে। বই পড়তে শিখেছ। তুমি তো জান, কারও কাছে কিছু চাইতে নেই। জান না তুমি?" খোকার মুখের দিকে ঘাড় কাত করে তাকায় সে।

খোকা চলতে চলতে ঘাড় নাড়ল।

"শোন খোকা। কাল তোমাকে আমি দুটো লেবু কিনে দেব। কেমন?"

কোন উত্তর না দিয়ে খোকা বাবার হাত ধরে চলতে লাগল।

আশুতোষ কলেজের সামনে এসে হরিপদ একবার তাকিয়ে দেখল কলেজ বিল্ডিংটার দিকে। এখানেই সে পড়েছিল। তখন তার কত আশা। হরিপদ মিত্র তখন কলেজেরও আশা। যেবার ম্যাট্রিকে থার্ড হয়ে সে কলেজে ভর্তি হ'ল সেবারই তার বাবা মারা গেলেন। ভাল ছেলে ও, তাই সেইটুকুর ওপর ভরসা করেই দাদারা তার পড়াশুনা চালিয়ে গেলেন বি-এ পর্যন্ত। এর পর কোনদিনও সে সেকেণ্ড ছেড়ে থার্ড হয়নি।

"বই-এর পোকা ও।" বলত ওকে বন্ধুরা। "ওহে হরিপদ, বলি বই ছাড়াও বাইরের জগতে কিছু দেখবার আছে। সে খবর রাখ?"

শুধু হাসত হরিপদ। বলুক না বন্ধুরা। সে জানে, তার ওপর শুধু তার সংসারের সুনামই নির্ভর করছে না, সারা কলেজের সুনামও নির্ভর করছে। ভাল করে তাকে পাশ করতে হবে।

সেবার এম-এ পড়ার সময় একজনের সঙ্গে তার প্রথম বন্ধুত্ব হ'ল জোর রকমের। সে প্রণব। সবাই বলল, যদি এতদিন বাদে সে বন্ধুই করল তাহলে সেখানে পুরুষ না হয়ে নারী নির্বাচনের বয়স নাকি তার হয়েছে। কিন্তু নির্বিকার রইল হরিপদ। প্রণবের পড়াশুনা আছে, ও অনেক বাইরের খবর রাখে। সেই প্রণবই একদিন ওকে খবর দিল অনিমার।

"আমার মাসতুত বোন। বেশী পাস না করেও যে একটা মেয়ে কত শিক্ষিত হতে পারে তার উদাহরণ পেতে পারবে ওর সঙ্গে আলাপ করে।" বলেছিল প্রণব।

আর হরিপদ যথারীতি অনিমার সঙ্গে আলাপ করে তৃপ্ত হয়েছিল। তার বেশী নয়। সকলের সন্দেহকে ভূমিসাৎ করে দিয়ে সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল যে বই ছাড়া আর কোন জিনিসকেই সে ভালবাসতে পারবে না। আর বইকেই ভাল বেসেছিল সে। অধ্যাপকরা আশা করেছিলেন, সে বেশ একটা কিছু করবে। আর তার বাড়ীর লোকে আশা করেছিল এবার বড় চাকরি পেয়ে হরিপদ তাদের সব কষ্ট ঘোচাবে।

কিন্তু কোন কিছুই হ'ল না হরিপদর। এমন কি ফার্স্ট ক্লাশও পেল না। একটি উঁচুদরের সেকেণ্ড ক্লাস পেয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল। তার আজীবনের সাধনা একবারের অসাফল্যে নষ্ট হয়ে গেল। যে ছেলেটি ফার্স্ট হ'ল তার নাকি বরাবরের রেকর্ড ভাল না, তার বাবা পরীক্ষক ও অধ্যাপকদের মধ্যে একজন ছিলেন বলে তাকে উঁচু নম্বর পেতে

বেগ পেতে হয়নি। আর সেবার ফার্স্ট ক্লাশও কাউকে দেওয়া হয়নি।

হরিপদ ভেঙে পড়ল। তার আশা ছিল এরপর সে গবেষণা করবে। কিন্তু তাও হ'ল না। পরিমল নামে যে ছেলেটি ফার্স্ট হ'ল সে বিলেত যাবার আগে বিয়ে করে নিয়ে গেল অনিমাকেই। অথচ প্রণবের মুখে হরিপদ শুনেছিল, অনিমার নাকি স্কলারদের ওপর বেজায় ঝোঁক, যার জন্য হরিপদকেও সে পছন্দ করেছিল।

নিজের ময়লা ছেঁড়া পাঞ্জাবিটার দিকে একবার তাকাল হরিপদ। পরার যোগ্য দ্বিতীয় পাঞ্জাবী আর না থাকায় এটাই তাকে পরতে হচ্ছে আজ সাতদিন না কেচে। ঘরে সুরমা অসুস্থা। খোকা জন্মাবার পর একটি মেয়ে হবার পর থেকেই সুরমা ক্রমশঃ শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। মেয়েটি মারা গেল তিন মাসের ভেতরই। কিন্তু তার মাকেও আধমরা করে রেখে গেল।

কত আশা করে সুরমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন মা, হরিপদর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও।

"বিয়ে না করলে কি চলে? আমি চোখ বুজলে সংসার দেখবে কে?" বলেছিলেন মা।

"সে চলে যাবেই। যারা বিয়ে করে না তাদের সংসার চলে না? সবে চাকরিতে ঢুকেছি, এই মাইনে, এতে চালাব কোথা থেকে?"

"সেই জন্যেই তো গরীবের ঘরের স্বাস্থ্যবতী মেয়ে আনছি বাবা। গতরে খেটে সে তোমার সংসারে লক্ষ্মী আনবে।"

লক্ষ্মী এনেছেই বটে। মা তো তাঁর কর্তব্য করে চোখ বুজলেন। আর বিয়ের সাত বছরের মধ্যেই তিনটি ছেলেমেয়ের জন্ম দিতে গিয়ে লক্ষ্মীর আহ্বানকারিনী শয্যাশায়ী হলেন। গতরে খাটা তার আর হ'ল না।

মাসকাবারে হাতের পয়সা একেবারে শেষ হয়েছে। অথচ লেবুর রসের সঙ্গে ওষুধটা খাওয়ানোর কথা। তাই যে করেই হোক লেবু দুটি তাকে কিনতেই হ'ল। খোকার জামাটার দিকে একবার তাকাল হরিপদ। ছেলেটার এত শখ বাইরে বেরোবার, না হলে জামা কাপড় বা স্বাস্থ্য কোনটাই তার পক্ষে এত হাঁটা বা বেরোনোর উপযুক্ত নয়। তাছাড়া ঘরে বড় মেয়ে রান্না বা রোগী নিয়ে থাকবে। খোকাকে একটু আগলানও হ'ল। তাই বেরোবার সময় খোকাকে নিয়ে বেরোনোই শ্রেয় মনে করেছিল হরিপদ।

"বাবা, মা দুটোই খাবে কেন?" চিন্তায় ছেদ পড়ল হরিপদর। এতক্ষণেও তাহলে খোকা লেবুর কথা ভুলতে পারে নি।

"মার যে অসুখ।"

"আমারও কাল অসুখ করবে। আমাকেও দুটো দেবে বাবা?"

রীতিমত আঘাত পেল হরিপদ। কি যে ভালবাসে ছেলেটা

কমলালেবু। যে করেই হোক, ও-মাসে মাইনে পেলেই হরিপদ একেবারে এক টাকার লেবু কিনে ফেলবে।

"অসুখ করবার দরকার নেই বাবা। দেখ না দু তিনদিন বাদেই তোমাকে এক সঙ্গে এক টাকার কমলালেবু কিনে দেব।"

"এক—টাকার ?" খোকা টেনে টেনে উচ্চারণ করল। সেই লোকটা যেমন এক ঠোঙা নিয়ে গেল তেমনি, না বাবা ?"

"হ্যাঁ।" ছোট্ট একটা উত্তর দিয়ে খোকার হাত ধরে মোড়টা পেরোতে গেল হরিপদ।

এই সময়েই ওপাশের রাস্তা থেকে মোড় ফেরাবার জন্য গাড়ীটা এসে যে তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে তা কে জানত ?

অনেক লোকজন ছুটে এল। হৈ হৈ করে উঠল সবাই। ভিড় সরিয়ে লোকজনদের বুঝিয়ে গাড়ীর আরোহী ওদের কাছে এলেন। খোকার কিছু হয়নি, কিন্তু হরিপদ হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় পড়েছে। হাঁটুর কাছে কাপড় খানিকটা ছিঁড়ে গেছে, হাতের চেটো আর কনুই থেকে অল্প রক্ত বেরোচ্ছে।

যেখানে হরিপদ পড়েছিল, সেখানেই তার হাত থেকে ছিটকে যাওয়া লেবু দুটো পড়ে রইল।

দামী স্যুটে নিজেকে মুড়ে যে ভদ্রলোক সান্ধ্যভ্রমণে খুশী মনে বেরিয়ে ছিলেন, তিনি তাঁর বিরক্তিভরা মুখে কষ্ট করে হাসি টেনে এগিয়ে এলেন। হরিপদ ততক্ষণে ধুলো ঝেড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে।

"আমি সত্যিই দুঃখিত। আপনার খুব লেগেছে বুঝি ?"

না তো কি ঠাট্টা করছে পড়ে যাওয়ার ভান করে—হরিপদ মনে মনে ভাবল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, "নাঃ বিশেষ কিছু হয়নি। অল্প ছড়ে গেছে।"

"চলুন আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।" ভদ্রলোক উৎসুক চোখে তাকালেন ওদের দিকে—"এস খোকা।"

খোকার দৃষ্টি এতক্ষণ লেবু দুটোর ওপর ছিল, হাত বাড়িয়ে নিতে গেল সে লেবু দুটো। আর সেই সময়ই খোকাকে হাত ধরে টানতে গিয়ে দামী জুতো শুদ্ধ পায়ে অজান্তে মাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক লেবু দুটোকে।

"আমাদের লেবু!"—প্রায় আর্তনাদ করে উঠল খোকা।

"কি হ'ল ?" হকচকিয়ে একটু পিছু হটে গেলেন ভদ্রলোক। ছেলেটা হঠাৎ চেঁচাল কেন ?

"আমাদের কমলালেবু!"—ফুঁপিয়ে উঠল খোকা।

"কই ? ওঃ।" এতক্ষণে পায়ের দিকে চোখ পড়তে বুঝতে পারলেন উনি।

"তাতে কি ? এই নাও।"—গাড়ী থেকে উনি বার করে আনলেন এক ঠোঙা কমলালেবু। খোকা দেখল ঠিক সেই ভদ্রলোকের ঠোঙার মত বড় বড় কমলালেবুতে ভর্তি।

তাড়াতাড়ি সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এগিয়ে গিয়ে বাবার হাত ধরল খোকা। "চল বাবা।"

"খোকা শোন, গাড়ীতে এসো, তোমাদের পৌঁছে দেব।"

"না।" গম্ভীর হয়ে বলল হরিপদ, "হেঁটেই যাব, অভ্যেস আছে।"

"তাহলে এই লেবুর ঠোঙাটা নাও খোকা।" ভদ্রলোকের গলায় বেশ আগ্রহ ফুটে ওঠে।

"না।" এবার মোটা গলায় বলল খোকা। তারপর তার বাবার হাত ধরে এগিয়ে গেল।

বাড়ীর দরজায় এসে কড়া নাড়ল হরিপদ।

"বাবা!" খোকা ডাকল। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলে নি।

"কি?" হরিপদর স্বর বিষণ্ণ।

"আমাকে দিলেও আমি কিন্তু নিইনি বাবা। আমি তো চাইনি তবু দিল কেন বাবা? কিন্তু আমি নিইনি। আমি কি হ্যাংলা?

বড় বড় চোখ মেলে তাকাল খোকা বাবার মুখের দিকে। হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারল না হরিপদ। শুধু তার হাতটা আরো শক্ত করে ধরে বাড়ীর ভেতর উঠে এল।

বিচিত্র মন

অন্যের কথা কি বলব? নিজের মনের খবরই কি সবাই জানে? আমার তো তা মনে হয় না। কত মানুষ তো দেখলাম, কত বিচিত্র মন তাদের, বাইরে তারা এক, আবার ভেতরে আর এক রকম। কি জানি মনের ডাক্তার হয়ত বা এর তল খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি নিজের মনই নিজে বোঝা যায় না। এ অসম্ভব।

আমি জীবনে যা করতে চেয়েছি হয়তো তার উল্টোটি করে বসেছি। যা চাইনি তাই ঘটে গেছে। যেটা না হলে আমার চলবে না মনে করে ক্ষেদ করেছি, পরক্ষণেই সেটির প্রতি নিদারুণ এক নিস্পৃহতা অনুভব করেছি। বিশেষ করে প্রেমের ক্ষেত্রে। যাকে ছাড়া বাঁচব না মনে হয়েছে তাকে নিঃশেষে ভুলেছি, আর যার অস্তিত্বকেই স্বীকৃতি দিইনি তার কাছে···

পনের বছর বয়সে যে মেয়েটিকে আমি ভালবেসেছিলাম, সে আমার থেকে চার বছরের বড়। আমি তখন সবেমাত্র বঙ্কিম আর শরৎ শেষ করেছি, রবীন্দ্রনাথ তখন আমার মানস গুরু, আর সেই সময়ই অচলাকে দেখলাম এক চায়ের নিমন্ত্রণে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভালবেসে ফেললাম। তার বয়স তখন উনিশ। উনিশের যে কি মাধুর্য তা আমার থেকে আর ভাল করে কে বুঝবে? কবিরা পঞ্চদশী, অষ্টাদশীর বর্ণনায় মুখর, কিন্তু তারা

কি কখনও উনিশ বছরের ফোঁটা ফুল দেখেনি? তারা বোধ হয় দেখেনি, কিন্তু আমি দেখেছিলাম, আর দেখামাত্র প্রেমে পড়তে দ্বিধা করিনি।

অচলাকে যখন কথাটা জানালাম, অন্ধকারে সাপের গায়ে পা দেওয়ার মত অচলা যেন চম্‌কে উঠল।

"পাকামো ক'র না।" রাগে লাল হয়ে গেল অচলার মুখ।

"পাকামো কিসের? তোমাকে ভালবাসা কি অপরাধ?"

জোরে হেসে উঠল অচলা। "অপরাধ?" আবার এক বার জোরে জোরে হাসল, আর আমি ক্ষুব্ধ অপমানে জ্বলতে লাগলাম।

"আচ্ছা শোন।" এককোণে ডেকে নিয়ে গেল অচলা। "তোমার বয়স কত বল ত? প্রেমের বোঝ কি?"

"দেহের বয়স আর মনের বয়স তো সকলের সমান নয়। আমি যদি প্রেমের কিচ্ছু নাই বুঝি তো প্রেমের গল্প লিখি কি করে?"

"ওসব তো তোমার উদ্ভট কল্পনা। গল্পের প্রেম আর জীবনের বাস্তব প্রেম এক হয় না।"

"কিন্তু বাস্তব প্রেমকে ভিত্তি করেই তো সাহিত্যে…"

আমার কথা থামিয়ে দিল অচলা।

"ব্যস—ব্যস, আর নয়। তোমার কাছে সাহিত্যের প্রেম সম্বন্ধে আর একদিন শুনব। আজ সুপ্রতিম আসবে এখনি।

আমার এখনও কিছু হয়নি।”—মোটা একটা চিরুনি দিয়ে তার চুলের জট্ ছাড়াতে লাগল অচলা। আর চুলের মধ্যে তার সুন্দর ফর্সা আঙুলের চলাফেরা দেখে আমি তাকে আরও গভীর ভাবে ভালবাসতে লাগলাম।

“সুপ্রতিম!” রাগ করে বললাম, “জানো ঐ নামটা পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারি না।

“তুমি না পারাতে কিছু এসে যায় না।” আবার হাসল অচলা, “আমি যে খুব বেশী রকমের পারি।”

“তুমি কি নিষ্ঠুর!” প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম আমি।

“তাই নাকি?”—আমার মাথায় একটা নাড়া দিয়ে জোরে হেসে উঠল অচলা, তারপর বাড়ীর ভেতর চলে গেল। আর আমি পাথরের মত বসে রইলাম প্রত্যাখ্যাত প্রেমের অপমানের জ্বালা সহ্য করে।

আধ ঘণ্টা পরে সুপ্রতিম যখন এসে পৌঁছাল, অচলা তখনই বেরিয়ে এল। সাজসজ্জা শেষ করেও সে সুপ্রতিমের আসার অপেক্ষাতেই দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল নাকি? না হলে এক মুহূর্তও সুপ্রতিমকে অপেক্ষা করতে হ’ল না কেন?

এতক্ষণ ভাবছিলাম অচলার কথা। কি কঠিন মেয়ে! আমার এতখানি ভালবাসা ওকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারল না। রীতিমত আহত হলাম আর ঈর্ষায় মরে গিয়ে দেখতে লাগলাম

এই কঠিন মেয়েই কি কোমল হয়ে গেল সুপ্রতিমকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে।

"তুমি তাহলে এখন কি করবে? আমরা তো বেরোচ্ছি।" সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অচলা জিজ্ঞেস করল।

"আমিও যাব" তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম চেয়ার থেকে।

"তোমাদের কথাবার্তায় বাধা দিলাম নাকি?" যেতে যেতে সুপ্রতিম জিজ্ঞেস করল অল্প হেসে।

ওর হাসি যেন ছুরির মত আমাকে কেটে কেটে যেতে লাগল। এই প্রথম কোন লোকের প্রতি আমি বিজাতীয় ক্রোধ অনুভব করলাম।

এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম অচলাকে আজ অপূর্ব দেখাচ্ছে। অন্যদিন বা সময় হলে নিশ্চয়ই কিছু বলে উঠতাম। যে রংএর শাড়ীতে ওকে প্রথম দেখে আমি ভালবেসেছিলাম, আজ যেন বেছে বেছে ঐ শাড়ীটাই পরেছে অচলা। আমি মনে মনে আবার অচলার সৌন্দর্যের প্রশংসা না করে পারলাম না। অচলার রূপ দেখে আমার বরাবরই মনে হ'ত এ সৌন্দর্য কেবল দূর থেকে তারিফ করার, একে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। আমার মনে হ'ত একে ছুঁলেই এর পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। আজ সে মত সম্বন্ধে আরও নিশ্চিন্ত হলাম।

অচলার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ হয়েছে ভেবে মনকে স্থির

করতে চাইলাম, কিন্তু তার সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য আমার মনকে তারই দিকে টেনে রাখত। অচলা আমার প্রেমের সম্মান দেয়নি বলে ওর বাড়ীতে যাওয়া ছাড়লাম। কিন্তু ওর ওপর রাগ হ'ল না। মনে হ'ল ও ঠিকই করেছে, ও তো কারও পার্থিব প্রেমের প্রতিদান দিতে পারে না। ও যে স্বর্গীয়!

কিন্তু এর ঠিক এক বছরের মধ্যেই যে আমার মনের ভাব এমন হবে কে জানত ?

সেদিন অচলার বাড়ীতে গিয়ে যখন পৌঁছুলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আমার কাছে ওর কতকগুলো বই ছিল। ফেরৎ দেবার জন্য নিজেই গিয়েছিলাম ওদের বাড়ীতে। বাড়ী অন্ধকার। বোধ হয় কেউ নেই। দরজায় আস্তে আস্তে কড়া নাড়লাম। হিন্দুস্থানী একটা চাকর এসে দরজা খুলে দিল। বোধহয় নতুন এসেছে এ বাড়ীতে, আগে তাকে দেখিনি। জিজ্ঞেস করলাম—"বাড়ীতে কেউ নেই ?"

"জী।"

"দিদিমণি আছেন ?"

"জী।"

বুঝলাম এর সঙ্গে সময় নষ্ট করা বৃথা। অতএব আমার অতি পরিচিত অচলার শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

"অচলা!"—বলে ডেকেই পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলাম আমি।

পরক্ষণেই বেরিয়ে এলাম। আমার তখন জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। থাকব কি চলে যাব ভেবে পেলাম না।

অচলা ঘুমোচ্ছে। তার অসংবৃত জামা-কাপড়ে, তার হাঁ-করা মুখে, আর ঘুমানোর ভঙ্গিতে সব মিলিয়ে এমন একটা দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে, যা দেখে আমার মনে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। ভাল-লাগা মন্দ-লাগার ক্ষমতা আমার ভেতর যে একই সঙ্গে এভাবে কাজ করছে তা কে জানত? এই নারী দেহ? এই দেহকেই আমি এতদিন আমার হৃদয়ের সবটুকু পূজা নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছি?

আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম বাড়ী থেকে। মনে হ'ল অচলাকে বোধ হয় আমি কোনদিনই ভালবাসিনি। তা না হ'লে ইতিমধ্যেই ওর প্রতি আমি এত তীব্র বিতৃষ্ণা অনুভব করতে আরম্ভ করেছি কেন?

সত্যিই এরপর থেকে অচলার স্মৃতিমাত্র আমার কাছে খারাপ লাগতে লাগল। তাকে যে কোনদিনই ভালবেসেছিলাম, সে কথা নিঃশেষে ভুলে যেতে চাইলাম।

অচলার কাছে আমার মন যে আঘাত পেল জীবনে তার পুনরাবৃত্তি ঘটবার সম্ভাবনা রদ করবার যথোপযুক্ত আয়োজন আমার নিজের ভেতর আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বলে বিশ্বাস করলাম। আর আমার এই আভ্যন্তরিক প্রতিবাদ এত জোরাল হ'ল যে বহুদিন, প্রায় দশ বছর ধরে, কোন মেয়ের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা ঘটতে পারল না।

কত মেয়ের সঙ্গেই তো পরিচয় হ'ল। কত মেয়েকেই তো দেখলাম। কিন্তু কাউকেই ভালবাসার কথা ভাবতে পারলাম না। সত্যি বলতে কি দেহের ব্যাপারে আমার কেমন একটা আপত্তিই জন্মে গিয়েছিল। তাই যে মেয়েটিকে ভাল লাগবার পরই মনে হ'ত মেয়েটি সুন্দর, তার দেহ তাকিয়ে দেখবার মত, তখনই আমার মনে হ'ত যে এর ভেতরও হয়ত কিছু স্থূলতা আছে যা আমার মনকে আবার পীড়িত করে তুলবে।

ইতিমধ্যে সাহিত্য-প্রীতিবশত আধুনিক কবিতার রসে আমার মনকে ভরিয়ে তুলেছি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তো আমার শেষ হয়েছে অনেক আগেই। এখন আধুনিক কবিদের কবিতার বহু ভাল ভাল লাইন আমার সর্বদাই মনে ঘোরে। এমন কি তাঁদের সমধর্মী ইংরেজ ও ফরাসী কবিদের সঙ্গে তাঁদের কতটুকুই বা পার্থক্য আর কোথায়ই বা সাদৃশ্য তাও আজকাল বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারি। বন্ধু-সমাজে কবি ও বিদগ্ধ ব্যক্তি বলে কিছু খ্যাতিলাভও করেছি।

আমার ছোট বোন মঞ্জুর বন্ধু রুণুকে আমার ভাল লাগল তার লেখা "আধুনিক সাহিত্যে নিসর্গের স্থান" প্রবন্ধটি পড়ে। প্রকৃতির কবি বলে পরিচিত এক আধুনিক কবির বহু উদ্ধৃতি সে বেশ লাগসই ভাবে ব্যবহার করেছে। মাঝে মাঝে তার বিস্ময়কর মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আধুনিক কবিদের অনেক কবিতাই তার বেশ জানা আছে।

তার সঙ্গে অনেক বিষয়ে দ্বিমত হওয়া সত্ত্বেও বুঝতে পারলাম

রুণু প্রবন্ধটি অসম্ভব ভাল লিখেছে। সাহিত্য জগতে আমার যেটুকু পরিচয় ছিল তারই ফলে মঞ্জুর অনুরোধে আমি ওর প্রবন্ধটা একটা পত্রিকায় বার করতে সাহায্য করলাম।

সেদিন ধন্যবাদ জানাতে এসে রুণুর সঙ্গে আমার দু-তিন ঘণ্টা এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা হ'ল। সাহিত্যের কোন দিকই বোধ হয় বাদ রাখলাম না। বার বার ওর সঙ্গে আমার মতের অমিল হওয়ায় আমি বেশ অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগলাম, অথচ রুণু বেশ ধীরভাবে যুক্তি দিয়ে তার নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে লাগল।

এ রকম সাহিত্য সভা প্রায়ই হ'ত। একজন নীরব শ্রোতা, আমরা দুজন তার্কিক। ক্রমশঃ এই আলোচনা সভা একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেল। নানা বই পড়ে নিজেকে শানিয়ে রাখতাম, জোরাল যুক্তি দিয়ে রুণুর মতামতকে নস্যাৎ করবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতাম।

বন্ধু-বান্ধবরা টিটকারি করত আমি প্রেমে পড়েছি ভেবে। আর আমার হাসি পেত রুণুর প্রেমে পড়া যায় এই কল্পনামাত্রে।

সেদিন রবিবারের সকালেই আমাদের আলোচনা সভা জমে উঠল। ইদানীং আমাদের সভার শ্রোতাটি প্রায়ই অনুপস্থিত থাকত। তাতে আমাদের কিছু অসুবিধা হ'ত না। আমি আর রুণুই ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে যেতাম।

যে জানলা দিয়ে রোদ আসছিল, তার ঠিক উল্টো দিকেই রুণু বসেছিল। মুখে রোদ লাগার দরুন হাত দিয়ে বারবার সে

চোখ আড়াল করছিল। বুঝলাম রুণুর অসুবিধা হচ্ছে। উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিলাম। ফিরে আসবার সময় একটা টেবিলে ধাক্কা লেগে পায়ে ব্যথা পেলাম।

"উঃ!" বলে পা-টা ধরে খাটের এককোণে বসে পড়লাম।

"দেখি দেখি কোথায় লাগল?" রুণু চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এল।

"পায়ে। হাত দিও না।" নিজের পায়ের আঙুলটা চেপে ধরে বল্লাম।

"তাতে কি হয়েছে? দেখি না কি হল।" জোর করে কোথায় লেগেছে দেখতে গেল।

"ছাড়ো।" হাতটা সরাতে গেলাম, আর এই প্রথম যেন অনুভব করলাম, রুণু একটি মেয়ে। ওর হাত আমার হাতের মধ্যেই ধরা রইল, আস্তে আস্তে ওর হাতটা আমার দু হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে ওর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম।

রুণু বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করছিল। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গিয়ে ওর নিজের চেয়ারে বসল।

আমি ধীরে ধীরে গভীর গলায় ডাকলাম—"রুণু।"

"কি হল আবার?" ওর মুখটা লাল হয়ে গেছে, কিন্তু ভাব গোপন রাখার চেষ্টা করতে ও দ্বিধা করল না।

"বড্ড ব্যথা লাগছে।"

"তবে?" ও এবার যেন সত্যিই খুশী হল, অন্য কিছু বললাম না বলে। একেবারে কাছে চলে এল তারপর ঝুঁকে

পড়ে বলল—"দেখি! ইস্ রক্ত পড়ছে, দাঁড়ান জল নিয়ে আসি।"

ওকে আঁচল ধরে টেনে আনলাম নিজের কাছে, তারপর প্রায় ফিসফিস করে বললাম ওর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে—"ব্যথাটা পায়ে নয়, এখানে।" ওর হাতটা টেনে নিয়ে আমার বুকের বাঁ দিকে চেপে ধরলাম।

"ছাড়ুন!" গম্ভীর হয়ে ধীরে ধীরে ওর হাতটা ছাড়িয়ে নিল রুণু। তারপর ফেলে রাখা ওর বইগুলো গুছিয়ে নিল। পেনটা তুলে নিয়ে ব্লাউজে গুঁজে বলল—"আজ যাই।"

আমি এতক্ষণ চুপ করে দেখছিলাম। ও আমার দিকে চোখ তুলে তাকানো মাত্র কি যেন অনুভব করলাম। সব কিছু ভুলে ওকে কাছে টেনে আনলাম। ওর হাত থেকে সব বই পড়ে গেল সশব্দে। আর ও কিছু বলবার আগেই চুম্বনে চুম্বনে ওকে ভরিয়ে দিলাম। ওর পাতলা দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল।

ঠিক সেই সময়েই মঞ্জু ঘরে ঢুকল—"দাদা!"—প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সে।

সম্বিত ফিরে পেলাম। যে পশুটা মাতাল হয়ে এই কাণ্ড করল তার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে রুণু দু-হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। তার কান্না যেন ধীরে ধীরে সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে গেল। আমি ভয় পেলাম।

মঞ্জু আমার দিকে ঘৃণা আর বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে

রইল। সে অবাক হয়েছে।

কিন্তু সব থেকে বেশী অবাক হয়েছি আমি নিজে।

যে-আমি দেহ সম্বন্ধে একটি চীনের পাঁচিল তুলেছি বলে জানতাম, তার পক্ষে কোন মেয়ের সঙ্গেই যে রক্তমাংসের সম্বন্ধ ঘটতে পারে না—এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত ছিলাম। এমন কি কোন মেয়ের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা হতে পারে এ বিষয়ে কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল।

কিন্তু আজ এ কি হল? রুণু, যাকে প্রতিনিয়ত দেখছি, ছোট বেলা থেকে যে আমাদের বাড়ী এসে প্রায় মঞ্জুর সমানই হয়ে গেছে এ বাড়ীতে, দেহের সৌন্দর্য যার বিশেষ প্রায় কিছুই নেই, তাকে আমার আকর্ষণীয় লাগবার কোন কারণ তো ঘটে নি।

সত্যি সত্যিই নিছক সাহিত্য আলোচনার জন্যই যে আমরা রোজ গল্প করতাম, আমাদের রোজকার আলোচনা সভায় যে এক মুহূর্তের জন্য সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছুর আলোচনার সম্ভাবনা পর্যন্ত ছিল না, এখন কি করে তা বোঝাব?

মঞ্জুর সরল চাহনি যেন আমাকে নীরব তিরস্কার করতে লাগল। আর হতভম্বের মত বসে রইলাম আমি।

করকোষ্ঠী

বড় রাস্তার ধারেই ফুটপাতে বেশ গুছিয়ে নিয়ে বসেছে লোকটি। পেশা চালাবার জন্য যা দরকার, তার টুকিটাকি জিনিস সংগ্রহ করে সযত্নে সাজিয়ে রেখেছে। সামনে একটা বাক্সের ওপর গাঢ় চন্দনের প্রলেপ, তার ওপর দুটি পেতলের খড়ম। খড়ম দুটি ফুল আর চন্দনে ঢেকে দিয়েছে। একটি কম্বল পেতে বসেছে লোকটি। রোদ থেকে বাঁচবার জন্য পুরানো তালিমারা একটা ছাতা খুলে দিয়েছে। এককালে ছাতার রং কালোই ছিল বোধ হয়। তবে আজ সেটা ময়লা ছাই রং-এ দাঁড়িয়েছে।

পাশে কয়েকটা বহু পুরানো ছেঁড়া বই। সামনে একটা তেলচিটে বড় কাগজে মস্ত বড় হাতের লাল ছাপ। রেখাগুলি স্পষ্ট করে টানা আর তার চারপাশে অসংখ্য কালীর লেখা। হাতের ছাপটি যে চৌকিতে রাখা সেটি একটি কাগজের ফুলে জড়ানো।

সকাল বেলা স্নান সেরে গঙ্গার ঘাটেই ফোঁটা-তিলক কেটে নিয়ে বসে গেছে লোকটি। হাওড়ার এ অঞ্চলে সর্বক্ষণই খুব লোকজনের যাতায়াত। আর গঙ্গায় স্নান করতে যাবার ও ফেরবার পথে কত লোকই তো বসে যায়।

"বাবাজী, বলিয়ে না মেরা নসিবমে সুখ হ্যায় কেয়া নহি।"

প্রৌঢ় এক পাগড়ীওলা লোক তার সামনে নিজের ফাটা ফাটা হাতের চেটোটা প্রসারিত করে বসে পড়ে।

বহুক্ষণ ধরে হাতটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সে। তারপর হঠাৎ কি যেন দেখতে পেয়ে মাথাটাকে পেছনে নিয়ে যায়। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে কোন এক নির্দিষ্ট চিহ্নের দিকে। মুখে তারিফের শব্দ করে তারপর বলে ওঠে, "বাঃ বাঃ!"

উৎসুক হয়ে ভাল করে বসে আগন্তুক। যে লোকটির কাছে তার ভবিষ্যতের সমস্ত সুখ-দুঃখের খবর এসে পৌঁছেছে তার প্রতি সম্ভ্রমে বোধকরি প্রৌঢ়ের মন ভরে যায়।

অচিরাৎ খুব বড় রকম একটা লাভের সম্ভাবনার আশ্বাস দিয়ে ওর হাতটা ঠেলে দেয় জ্যোতিষী। আবার কি মনে করে টেনে নেয়। ভুরু দুটো কুঁচকে ফেলে। তারপর ওর প্রসারিত হাতের মুঠিটা বন্ধ করে দেয়। এবার আগন্তুক বুঝি ভয় পায়।

"কৈ মুস্কিল হ্যায়?"

"হু!" গম্ভীর হয়ে বলে সে—"ভাগ্যে শনির দৃষ্টি আছে যে।"

"তব্ হাল কেয়া হোগা বাবাজী?"

"হাল আর কি?—কিছু খরচ করে গ্রহশান্তি করতে হবে।" মুখের নির্লিপ্ত ভাবটুকু যথাসম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা করে সে।

এক ঘণ্টা বাদে বহু দর কষাকষির পর কিছু দক্ষিণা দিয়ে যখন সে লোকটি উঠে পড়ে, তখন জ্যোতিষীর মুখে বেশ একটা

খুশীর আমেজ ফুটে ওঠে।

কোন কোন সময় সারাদিনে দুটো লোককেও হয়তো সে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারে না। সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে হতাশ মনে বাড়ী ফেরার সময় সামনে শুয়ে থাকা রাস্তার রুগ্ন কুকুরটাকে একটা সশব্দে লাথি মেরে এগিয়ে যায়। বহুদূর পর্যন্ত কুকুরটার ঝিমরে ঝিমরে কান্না শোনা যায়।

সেদিন কি একটা পর্বের দিন ছিল। সকাল থেকে কত লোকই গেল। মনটা ভালই ছিল জ্যোতিষীর। একটি লোককে তো রীতিমত ঘায়েল করা গেছে। পুত্রশোকের মত মোক্ষম অস্ত্র ছেড়ে তার কাছে থেকে গোটা একটা টাকা আদায় করেছে সে।

দশটা নাগাদ তিন-চারটে মেয়ে আর বৌ দল বেঁধে স্নান করতে গেল। তার মধ্যে দুটি বেশ অল্পবয়সী।

একটি বৃদ্ধার হাত দেখতে দেখতে আড়চোখে একবার ভুরু কুঁচকে চেয়ে দেখল জ্যোতিষী। রাস্তায় এত জোরে হাসাহাসি করে যেতে দেখলে রাগ হবে না? মেয়েগুলো কী!

সব থেকে যে মেয়েটা বেশী হাসাহাসি করছিল তার বাঙালীর মত সাজ-পোশাক, কিন্তু কথাবার্তায় একটু অবাঙালীর টান। সঙ্গের বুড়ীর হাতে গঙ্গাজলের যে ঘটিটা ছিল তার থেকে খানিকটা জল মাটিতে পড়ে গেল তার হাসাহাসির জন্য। ধমকে

উঠল বুড়ী, "ফেললি তো! এই জন্যে তোর সঙ্গে আসতে চাই না সুভদ্রা। রাস্তায় এসেও ন্যাকামি যায় না।"

"রাস্তায় এলুম তো কি হল গো।"—জোরে হেসে উঠল সুভদ্রা, "এ তো কোম্পানীর রাস্তা। আমরা তো টেক্‌সো দিই। কি বল্ ভাই শান্তা।" পাশের সঙ্গিনীকে একটা ঠেলা দেয় সুভদ্রা।

এই সময় হঠাৎ তারও চোখ পড়ল জ্যোতিষীর দিকে।

"ও ভাই শান্তা! চ'না ভাই একটু নসিবটা জেনে লি।"

"আর নসিব জেনে কাজ নেই।" সঙ্গের বুড়ী গজগজ করে উঠল, "বেলা হয়নি? রান্নাবান্না নেই?"

"সে তো রোজ আছে গো দিদিমা। আমি একটু হাতটা দেখিয়ে লিই।"

"তাহলে আমরা চললাম। তুই থাক।" বুড়ী এগিয়ে গেল। শান্তা নামে মেয়েটিও এগিয়ে যাচ্ছিল। আঁচল ধরে তাকে টেনে রাখল সুভদ্রা। বুড়ী ডাকল শান্তাকে।

"কি রে। তুইও হাত দেখাবি নাকি? দাঁড়ালি যে?"

"কি করি দিদিমা? সুভি যে টেনে ধরে রয়েছে। আচ্ছা তোমরা এগোও, আমরা যাচ্ছি একটু পরে।" শান্তা পেছিয়ে এল সুভদ্রার সঙ্গে।

জ্যোতিষী তখন এক বুড়োর হাত দেখে তার ভবিষ্যতের রহস্যের আবরণ সরাবার চেষ্টা করছিল।

"আমাদের হাতটা একটু দেখবে নাকি গণক ঠাকুর?"

সুভদ্রা এসে দাঁড়াল শান্তাকে নিয়ে।

একবার চোখ তুলে তাকাল ওদের দিকে, তারপর চোখের ইঙ্গিতে ওদের বসতে বলে আবার গড়গড় করে উপদেশ দিতে লাগল বুড়োকে।

অনেক দর কষাকষির পর লোকটা একটা সিকি ফেলে উঠে দাঁড়াল। সিকিটা একবার কপালে তারপর খড়মে ঠেকিয়ে বাক্সের ভেতর ফেলে দিল জ্যোতিষী। তাপর ওদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কার হাত আগে দেখবো ?"

"আমি হাত দেখাব না। ওর হাতটাই দেখ গো গণক ঠাকুর।" শান্তা সুভদ্রাকে দেখিয়ে দিল।

"শুধু হাত দেখাবে ? না কিছু ভবিষ্যৎ শোনাবে ?"

"ভবিষ্যতই তো শোনাব।"

"তাহলে এক টাকা লাগবে।"

"বারো আনা পাবে। দেখ বাবু হাতটা।" ওর মুঠিটা খুলে জ্যোতিষীর সামনে মেলে ধরল সুভদ্রা নিঃসঙ্কোচে। একটু যেন দ্বিধা করল জ্যোতিষী।

"কই গো ! দেখ।" এবার আর একটু এগিয়ে দিল হাতটা সুভদ্রা।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল জ্যোতিষী। শক্ত করে ধরল হাতটা সুভদ্রার। তারপর হাতের রেখাগুলোর দিকে তার মনকে আবদ্ধ করল।

বহুক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ওর হাতখানি। মাথাটাকে

পেছন দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে রইল কোন এক নির্দিষ্ট চিহ্নের দিকে।

খিলখিল করে হেসে উঠল সুভদ্রা: "অতক্ষণ ধরে কি দেখছ গো।"

এবার চোখ তুলে তাকাল জ্যোতিষী। বলল, "তোমার হাত তো সংঘাতিক।"

"হবে না? আমি লোকটিও যে সাংঘাতিক গো।" হেসে সুভদ্রা একটা ঠেলা দিল শান্তাকে।

"চুপ কর্ শুভি, ওকে বলতে দে।" শান্তা ওর কাঁধে হাত রাখল।

"ও বললে তো চুপ করি। বলে না যে।" ছোট গলায় বলল সুভদ্রা।

একবার তাকাল ওদের দিকে জ্যোতিষী।

"কতদিন বাঁচব বল তো?" সুভদ্রা ভয়ের ভান করে জিজ্ঞেস করে।

"তা মন্দ নয়। অন্ততঃ আশী বছর।"

সভয়ে চম্‌কে উঠে হেসে ফেলল সুভদ্রা।

"বল কি গো? আশী। তখন তো একবারে ঢকঢকে বুড়ী হয়ে যাব।"

"হ্যাঁ, আশী প্রায় হবে।" হাতটা ভাল করে দেখে নিয়ে জ্যোতিষী নিঃসন্দেহ হল্ যেন। "অদ্ভুত তো।" হঠাৎ কি একটা বুঝি খুঁজে পেল ওর হাতের রেখায়।

"কী অদ্ভুত গণক ঠাকুর ?" শান্তা ঝুঁকে পড়ল ওর হাতের ওপর।

"মাথা সরাও, ভাল করে দেখতে দাও।" তারপর সুভদ্রার দিকে চেয়ে বলে জ্যোতিষী, "আচ্ছা তোমরা তো এখানেই থাক, না ?"

"হ্যাঁ, এই গলিটা পেরোলেই আমাদের বস্তি।" সুভদ্রা বলল।

"পেয়ারা বাগানে ?"

"হ্যাঁ।"

"অন্যদিন তো দেখিনি তোমাদের।"

"আমরা তো প্রায়ই যাই। তবে সুভদ্রা তো থাকত না। এই ছ' মাস হল পেয়ারা বাগানে এসেছে।" শান্তা উত্তর দিল।

"তোমার নাম বুঝি সুভদ্রা ?"

"সে কথা গুণে বলতে পারলে না গণক ঠাকুর ?"

"তাহলে অঙ্ক কষতে হয়।"

"অঙ্ক কষে বুঝি সব বলতে পার ?"

"সব।"

"আচ্ছা বল ত আমার বয়স কত ? কোথায় আমার বাড়ী ? আমার কে কে আছে ?" হাসতে হাসতে সুভদ্রা বলে চলল।

"আস্তে আস্তে। এক সঙ্গে অত কথার উত্তর দেব কি

করে? এ সমস্ত শক্ত অঙ্ক তো এত তাড়াতাড়ি হয় না। আচ্ছা তোমার পনের বছর বয়সে কিছু হয়েছিল?"

গম্ভীর হয়ে গেল সুভদ্রা।

"হ্যাঁ, পনের বছরেই তো সাদি হল গো।"

"হ্যাঁ, ভারী তোর সাদি। জন্মে যে বরের মুখ দেখলি না।" শান্তা ঠেলা দিল ওকে।

ওদের কথায় কান না দিয়ে গম্ভীর হয়ে সুভদ্রার হাত দেখতে লাগল জ্যোতিষী, তারপর নীচু গলায় প্রায় ফিসফিস করে বলার মত করে বলল, "বিয়ের পরই তোমার স্বামী নিখোঁজ হয়, না?"

অবাক হয়ে গেল সুভদ্রা। সত্যি কি করে জানল লোকটা? সম্ভ্রম বেড়ে গেল তার।

"তার খোঁজ বলতে পার?"

"গুণে দেখতে হবে।"

"এখনি বল না।"

"না, আজ বলতে পারব না। কাল একবার এসো। গুণে দেখে রাখব। অনেক অঙ্ক কষে তবে তোমার স্বামীর খোঁজ পেতে হবে।"

উঠে দাঁড়াল সুভদ্রা। আঁচল খুলে একটা আধুলি বার করে জ্যোতিষীর হাতে দিল। বলল, "বাকিটা কাল নিও।"

ওর দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জ্যোতিষী। রং-চটা একটা জামার ওপর বেগুনি ডুরে শাড়ীটা ঘুরিয়ে পরেছে

সুভদ্রা। তার নিটোল বুক আর কোমরের প্রতিটি রেখার সৌষম্যে অভিভূত হয়ে গেল জ্যোতিষীর মন। একটু পরে সে বলল, "কাল ঠিক এসো। একটু সকাল সকাল। গুণে রাখব।"

ভিজে কাপড় ভাল করে গুছিয়ে হাতে তুলে নিল সুভদ্রা। তারপর হেসে বলল "আসবই তো গো। আমার হারিয়ে যাওয়া আদ্‌মিকে তুমি খুঁজে দেবে আর আমি আসব না?"

ওর আদ্‌মি। একবার বড় করে তাকাল ওর দিকে জ্যোতিষী। তারপর খড়মটাতে আধুলিটা ঠেকিয়ে বাক্সে ফেলল।

বস্তির শেষ দিকে একখানা নীচু চালার ঘরের দরজার তালা খুলল সুভদ্রা। তারপর ভিজে কাপড়টা বাইরের একটা ইটে রেখে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ পর গুনগুন করে একটা হিন্দী গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সুভদ্রা কাপড়টা মেলে দিচ্ছিল দড়িতে। শান্তা তার ঘর থেকে বেরিয়ে বলল, "কি রে শুভি? বরের খোঁজ পাওয়া যাবে শুনেই মনে ফুর্তি জাগল?"

কোন কথা না বলে ওর দিকে তাকিয়ে একবার হাসল সুভদ্রা। তারপর রোয়াকে রাখা বালতির উনুনটা টেনে নিয়ে উনুন ধরাতে বসল।

তার এখন পঁচিশ বছর বয়স। দশ বছর আগে ছাপরা জেলার এক অখ্যাত দেহাতে তার বিয়ে হয়েছিল একজনের সঙ্গে। তাদের সমাজের রেওয়াজমত অল্প বয়সে তার বিয়ে না হওয়ায় কত কথা শুনতে হয়েছিল তার বাপ-মাকে। প্রায় এক ঘরে হয়েছিল তারা। তবু বাবা তার সাদি দেয়নি। বরং চেয়েছিল আর পাঁচটা গোয়ালার মেয়ের মত তার মেয়ের জীবন যেন এভাবেই না যায়। গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন পড়েও ছিল সে। বাপের একমাত্র মেয়ে আর মোড়লের মেয়ে বলে তার ছোটবেলা যেভাবে কেটেছিল গ্রামের অন্য মেয়েদের সেটা ঈর্ষার বস্তু ছিল।

কিন্তু অত খোঁজখবর করেও যে বিয়ে হল তাতেও সে সুখী হল না। সকলে বলল সুভদ্রার কপালই খারাপ। নাহলে বিয়ের দুদিন বাদেই কারও স্বামী নিখোঁজ হয়?

কত খোঁজাখুজি করল তার বাবা, কিন্তু কোন পাত্তা পাওয়া গেল না রামকিষনের।

তারপর তারা চলে এল বাংলা দেশে। তার বাবা মারা যাওয়ার পর সে আর তার মা দেশের সম্পত্তি বেচে ফেলল। বাবার ব্যবসাটাকেই নিজের কাঁধে তুলে নিল সুভদ্রা। আরও কতকগুলো গরু কিনে সে ভাল করে জাঁকিয়ে বসল বাংলা দেশেই। যে জীবনকে এড়াবার জন্য তার বাবা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল সেইটাই একমাত্র সত্য হল সুভদ্রার। সে হল গোয়ালিনী। দুধ বেচাই হল তার পেশা।

"সুভদ্রা। জেরা পানি দেনা মা।" ঘরের ভেতর থেকে মার ডাক এল। বুড়ো হয়ে গেছে তার মা। দশ বছরেও ভাল বাংলা শিখতে পারল না। অথচ সে নিজেকে প্রায় বাঙালীই ভাবে। পাশের ঘরের শান্তা আর তার বাঙালী বর হরিশের দাম্পত্য জীবন দেখে তার রামকিষণকেও সে কবে যেন হরিশের সঙ্গে এক করে ফেলেছে।

"যাই!"—উনুনটা উঠানের এক কোণে সরিয়ে রেখে সে ঘরে ঢুকে গেল।

"কোন আবাগী আবার এখন আঁচ দিল ঢং করে?" ও পাশের ঝগড়াটে পঞ্চুর মা চেঁচিয়ে উঠল।

"আবাগী নয় গো। আমি!" সুভদ্রা জোরে জোরে হেসে তাকে বলল।

"আ মর্। ছুঁড়ির এত হাসি কিসের আসে বাবা জানি না।"—বেঁকা মুখ আরও বেঁকিয়ে পঞ্চুর মা ঘরে ঢুকে সশব্দে ভাঙা নড়বড়ে দরজা বন্ধ করে দিল ধোঁয়া আট্কাবার জন্য।

একটা ছোট উঠান ঘিরে চারদিকে মাটির দেয়াল্ আর টিনের চাল তোলা দশ-বারোখানা ঘর। একজনের আঁচ পড়লেই সব অন্ধকার। এজন্য কেউ কেউ উনুনটা রাস্তায় বসিয়ে আসে। সাধারণত এত বেলায় কেউ আঁচ দেয় না বলে আজ যেন আপত্তিটা একটু প্রবল হল।

"হাত দেখাবার শখ হল ধেড়ে বয়সে। তারপর মর্ তোরা ধোঁয়া খেয়ে।" ওপাশের রোয়াকে তরকারি নাড়তে নাড়তে

দিদিমা বলল। ও সকলেরই দিদিমা।

এদের কথার কোন উত্তর না দিয়ে শব্দ করে শিলনোড়ায় বাটনা বাটতে বসল সুভদ্রা। এসব তো নিত্যি গা-সওয়া। একটা যে-কোন ছুঁতোয় নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে অন্যকে জড়িয়ে ফেলার প্রয়াস।

বাটনা বেটে তরকারি কুটে রান্না শেষ করতে করতে বেলা হল। কাছেই মিলের বাঁশীতে দুটোর ভোঁ বেজে যাওয়ার পনের মিনিটের ভেতরেই পঞ্চু ওরফে পঞ্চানন এসে হাজির হল।

"মা ভাত দে তাড়াতাড়ি।" ঢুকতে ঢুকতেই চেঁচিয়ে খবর দিল পঞ্চু।

"দিচ্ছি দিছি।" ধড়মড় করে উঠে পড়ল পঞ্চুর মা। দুপুরের সুখনিদ্রাটুকু হবার যো নেই পঞ্চুর সকালের শিফটে ডিউটি থাকলে। সেও মেজাজে উত্তর দিল, "এত চেঁচাচ্ছিস কেন?"

"চেঁচাচ্ছি কি আর সাধে?" বুড়ী বলে শুনিয়ে শুনিয়ে, "না চেঁচালে ওর আসাটা তার পেয়ারের লোক জানবে কি করে?"

ইঙ্গিত বুঝতে দেরি হল না সুভদ্রার। পঞ্চানন তাকে জ্বালিয়ে মারছে এখানে এসে অবধি। ভোরে উঠে দাঁত মাজা

থেকে, রাতে বেসুরো বাঁশী বাজানোর চেষ্টা, সব কিছুরই কেন্দ্র সুভদ্রা। তার চুলটুকুও সে ঘরের বাইরে আঁচড়াতে পারে না।

সম্প্রতি তার উৎপাত বেড়েছে বেশী, কিন্তু এ নিয়ে টুঁ শব্দটিও করার যো নেই। তাহলে আর পঞ্চুর মা আস্ত রাখবে না তাকে। সেদিন তো প্রকাশ্যেই সে বলল—"মাগীর ঢং দেখেছ? আমার অমন ছেলেটার ওপর লোভ আছে আর কি! কচি মাথা চিবিয়ে খাবার যম। এখন দাম বাড়াচ্ছে, যেন কত অচ্ছেদ্দা!"

"তা আর বলতে!" ও ঘরের অন্নপূর্ণা সায় দিল, "আমাদেরও তো বয়েস ছিল গো, কই এমন ধারা ঢং তো দেখিনি দিদি। কতোই যেন সতী-লক্ষ্মী।"

সুভদ্রা একটু হাসে শুধু। সতীলক্ষ্মী কিনা সে জানে না। কিন্তু এদের মত জীবন-যাপন করতেও তার প্রবৃত্তি হয় না।

পঞ্চু ভাত খেয়ে দুপুরে এক ঘুম দেবার জন্য রোয়াকে চেটাই পাততে পাততে প্রবল বেগে শিশ দিয়ে সুর ভাঁজতে লাগল।

সুভদ্রার গা জ্বলে গেল। সবেগে ঘরের ভেতর ঢুকে মাকে জিজ্ঞেস করল, "ছেলেটা কি চায় বল ত মা? ও কি ভাবে ওকে আমার আদ্‌মি করব?" হেসে গড়িয়ে পড়ল সুভদ্রা মায়ের গায়ের ওপর।

"আরে, তু এত্‌না হাসিস কাঁহে?" মা বিরক্ত হল, "সরম নেই তুর? হরবখত এত্‌না হাসি কিস লিয়ে রে?"

"হরবখত হাসি পায় যে মা।" সুভদ্রার হাসি যেন থামতে চায় না।

দিন দুয়েক আর জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া হ'ল না। বৃহস্পতিবার সুভদ্রা সকালে উঠেই শান্তাকে ডাকল গঙ্গায় যাবার জন্য।

"আজ নয়।" শান্তা বাসন মাজতে মাজতে উত্তর দিল।

"না ভাই, আজই চল। আমার মন লাগছে না কাজে। শুনে আসি না কী বলে জ্যোতিষী।"

"কি আর বলবে? যত সব বুজরুকি।" শান্তা নিঃস্পৃহ ভাবে উত্তর দিল।

"না ভাই। আমার মনে লাগে, ও কিছু তো বলবে।"

"বলবে আর কি? তোকে যে ওর খুব মনে ধরেছে সে কথাটাই বলবে এবার।"

"যাঃ।" হেসে গড়িয়ে পড়ে সুভদ্রা শান্তার গায়ের ওপর, "কিন্তু সত্যি ভাই। গণক ঠাকুরের চেহারাটি বেশ। ও বুজরুকি করবে বলে তো মনে লাগে না।

"ও বাবা।" শান্তা চোখ বড় বড় করে বলল, "তোর মনেও যে রং ধরেছে রে? তাহলে তো যেতেই হয়।"

কাজ-কর্ম সেরে নিয়ে তারা দুজনে যখন গেল তখন দুপুর গড়িয়েছে বেশ। মাথার ওপর সূর্য। তার হাত থেকে বাঁচবার জন্য ময়লা একটা গামছা ছাতার ওপর থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছে জ্যোতিষী।

সুভদ্রা আসতেই জ্যোতিষীর চোখ দুটো যেন কথা বলে উঠল। কিন্তু ওদের দিকে না তাকিয়ে সে একমনে ছেঁড়া একটা বইয়ের পাতা উল্টে কি যেন সব পড়ে যেতে লাগল।

"কি গো গণক ঠাকুর? কোন হদিশ পেলে আমার আদ্‌মির?" স্বভাবসুলভ হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলল সুভদ্রা।

"বস।" গম্ভীর হ'ল জ্যোতিষী—"খবর ভাল নয়।"

"কেন, কী খবর?" যেন ভয় পেল সুভদ্রা।

"আস্তে আস্তে। অত তাড়াতাড়ি হ'লে কি চলে? বোস! ধীরে সুস্থে শোন। বইটা বন্ধ করে সামনে থেকে গামছাটা খুলে নিল জ্যোতিষী।

"দেখি, হাতটা আরেকবার দেখি।"

ব্যগ্র হয়ে সুভদ্রা হাত বাড়িয়ে দিল।

হাতটা টেনে নিয়ে ভাল করে দেখতে লাগল জ্যোতিষী। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে সুভদ্রা। তার মুখের দিকে একবার তাকাল জ্যোতিষী, তারপর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল, "খবরটায় ঘাবড়াবে না তো?"

কোন কথা না বলে শুধু মাথাটা নাড়ল সুভদ্রা।

"তোমার আদমির খোঁজ পেয়েছি। সে হাওড়াতেই

আছে। তবে তার যেন অসুখ বলে মনে হচ্ছে।”

“কী হয়েছে? কোথায় আছে বলতে পার?”

“পারি। কিন্তু তার আগে একটা কাজ করতে হবে তোমাকে।”

“বুঝেছি। তোমার মাতুলি কিনতে হবে তো?” শান্তা বাধা দিল, “আমার জানাই আছে। নে আবার গ্যাঁটি-গচ্চা দে কিছু।”

“না না, মাতুলী নয়। আমাকে কিছু দিতেও হবে না।” গম্ভীর হয়ে বলল জ্যোতিষী, “তোমার হাতের রেখা অদ্ভুত ভাবে বদলাচ্ছে। তোমাকে তিনদিন আমাকে হাতের রেখা দেখাতে হবে রোজ। তিনদিন বাদে আমি বলব, কী করতে হবে, কোথায় যেতে হবে।”

ওরা দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসল। জ্যোতিষীর প্রাপ্য ফেলে দিয়ে ওরা যখন ফিরতি পথ ধরল তখন শান্তাই প্রথম কথা বলল, “সত্যি ভাই শুভি, তুই এত বিশ্বাস করিস কেন ওর কথায়।”

“না করারই বা কি আছে? এমন তো কতই হয়।” অন্য-মনস্ক ভাবে উত্তর দেয় সুভদ্রা।

“তোর জন্য আমার দুঃখ লাগে সত্যি।” হঠাৎ শান্তা বলে ওঠে।

“কেন?”

“তোর এমন বয়েস, এমন চেহারা সব এমনি এমনি যাচ্ছে।”

যেন চমক্ ভাঙল সুভদ্রার, হাসতে হাসতে বলল, "তা ভাই, ঠাকুরের দয়া না হলে তো পূজা নিবেন না।"

"কোন্ ঠাকুর? গণক ঠাকুর?"

"মরণ আর কি!" খিল খিল ক'রে হেসে শান্তাকে জড়িয়ে ধরল সুভদ্রা।

পরের দিনগুলো সুভদ্রা একাই এল। জ্যোতিষী সমান আগ্রহে তার হস্তরেখা দেখল। শেষে সুভদ্রা একদিন স্পষ্টই জিজ্ঞেস করে বসল, "কি গো গণক ঠাকুর, আর কদ্দিন লাগবে? সত্যি সত্যি গুণতে জান তো, না এমনি এমনি—"

জ্যোতিষী কি যেন ভাবছিল, চমকে উঠল, "এসব কাজ নির্ভুল করতে গেলে সময় লাগেই। আচ্ছা, কাল তোমায় বলে দেব ঠিক। কাল এসো।"

"আবার কাল!" মুখে বলল বটে, কিন্তু সুভদ্রা যেন বিশেষ বিরক্ত হ'ল না। বরঞ্চ কথা শেষ হওয়ার পরও বসে রইল কিছুক্ষণ। দুপুর শেষ হয়ে এসেছে। সূর্যের আলো আর ততটা অসহ্য মনে হচ্ছে না। তবু ছাতাটা খোলা রইল। কেমন যেন আশ্রয় দেয় ঐ জরাজীর্ণ ছাতাটা।

"জান গণক ঠাকুর," সুভদ্রা হঠাৎ বলল, "কাল রাতে আমি ভারি মজার এক স্বপ্না দেখেছি।"

"মজার?"

"মজার নয় তো কি ?" মনে করতেই সুভদ্রা হেসে উঠল, "এক পাগলার বেসরম কাজ আর কি !"

"বেসরম ? কেন ?"

"নয় ? নাহলে রাস্তার ওপর আমার হাত ধরে টানাটানি ?"

ওর হাতটা ছেড়ে দিল জ্যোতিষী।

"আরে তুমি নয় গো।" হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ল সুভদ্রা, "ও সেই স্বপ্না-দেখা পাগলটার কথা বলছি। জানো গণক ঠাকুর—"

"বারবার গণক ঠাকুর গণক ঠাকুর বল কেন ?"

"তাহলে কি বলব ?"

"কেন শুধু ঠাকুর বলতে পার না ?"

"ঠাকুর ?"—জোরে হেসে উঠল সুভদ্রা। "বেশ তাই বলব।—তোমার দেশ কোথায় ঠাকুর ?"

"এখানেই।"

"বাঙালী না ? বামুন তো ?"

"নিশ্চয়ই !—তোমরা কী ?"

এবার আর হাত দেখে শুনে দেখতে বলল না সুভদ্রা। আস্তে আস্তে বলল, "আমরা আহির—মানে, গোয়ালা।"

"ও ! তা কটা গরু আছে তোমাদের ?"

"পাঁচটা। তবে আমার তো মনেই লাগে না এ ব্যবসা। আমার বাবার একদম ইচ্ছা ছিল না আমি দুধ বেচি। তা কি করব ? নসিব।"

"নসিব তো বটেই। তাতে দুঃখ কি? দুধ বেচে স্বাধীন ভাবে আছ তো। স্বাধীন ব্যবসা সব থেকে ভাল। দেখ না কত ভাল ভাল চাকরি ছেড়ে আমি এই স্বাধীন ব্যবসা করি।"

"এটা তোমার ব্যবসা বুঝি?"

"ব্যবসা মানে পুণ্যের কাজও বটে। কিন্তু তাতে পয়সাও তো আসে। তার জন্যে অনেক পড়াশোনা, যাগযজ্ঞ, অনেক কিছু করতে হয়। সবাই কি আর পারে একাজ! হঠাৎ গম্ভীর হয়ে নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হ'ল জ্যোতিষী। তারপর জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে যেন কতকটা আপন মনেই বলল, "তবে ব্যাপার হয়েছে কি জানো, একেবারে একা একা—সব দিক সামাল দিতে—"

একটি লোক এসে দাঁড়াল এই সময়। তাকে মাথা নেড়ে বলল জ্যোতিষী, "কাল এসো। আজ আর নয়।" লোকটি তবু গেল না। ভবিষ্যৎ জানবার আশায় না অন্য কোন আকর্ষণে বোঝা গেল না।

সুভদ্রা উঠে দাঁড়াল। রোদ প্রায় পড়ে এসেছে। নিজের চিন্তায় সে এমনি মশগুল ছিল যে পাঁচ-ছটা বাড়ীতে রোজের দুধ দিতে হবে তাও যেন তার খেয়াল ছিল না।

রবিবার দিন তার কিরকম যেন লাগছিল। আজ গণক ঠাকুর কথা দিয়েছে তাকে সব খবর খোলাখুলি বলবে।

দুপুর বেলা মাকে খাইয়ে দাইয়ে ছেঁড়া কাঁথাগুলো সেলাই করতে করতে সে কত কথাই ভাবছিল। রামকিষণকে সে মনে আনবার চেষ্টা করল। সে কিছু শিশু ছিল না তখন। পনের বছর বয়স। কিন্তু সরমে সে কি ছাই ভাল করে দেখেছে তার আদমির মুখ? আচ্ছা কি রকম হ'তে পারে? লম্বা মতো, চোখ দুটো বড় বড়, নিচের ঠোঁটখানি মোটা—মনে করতে গেলেই অন্য একটা মুখের সঙ্গে সাদৃশ এসে পড়ে। আপন মনেই হাসে সুভদ্রা। রাস্তার এক জ্যোতিষী, তাকে চেনে না, শোনে না—একটা জুয়াচোরও হতে পারে, তার কথা সে ভাবতে যাবে কোন্ দুঃখে!

হঠাৎ দামী সেন্টের গন্ধে চারিদিক ভরে গেল। একজন মাঝবয়সী মোটাসোটা ভদ্রলোক ঢুকলেন বস্তিতে। সঙ্গে বস্তির ভাড়া আদায়কারী সরকার গোপীবাবু।

অহেতুক বিনয়ে গলে গেল পঞ্চুর মা, আর বুড়ী দিদিমা। কারও দিকে দৃকপাত না করে পশ্চিমের বন্ধ একটা ঘরের দিকে এগিয়ে গেল তারা, তারপর দুড়দাড় করে ঘরের সব জিনিসপত্র ফেলে দিতে লাগল বাইরে।

প্রথমটা সুভদ্রা এদিকে বিশেষ নজর দেবার প্রয়োজনই অনুভব করেনি। কিন্তু দুমদাম শব্দে চমকে উঠে সে সেলাই বন্ধ করে পায়ে পায়ে এগিয়ে লোকগুলোর একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল।

একহাত কোমরে অন্য হাত ছড়ির ওপর রেখে আগন্তুক

বাবুটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকালেন লোকগুলোর দিকে।

বস্তির সব ঘরের বাসিন্দাই ততক্ষণে উঠানে জড়ো হয়েছে।

তারপর সুভদ্রার দিকে চোখ পড়তে জিজ্ঞেস করলেন গোপীকে, "মেয়েটা কে হে?"

সুভদ্রা একটু সরে গেল।

"আজ্ঞে ও তো গয়লানী বুড়ীর মেয়ে। দু মাস হ'ল স্যার পুবের ঘরখানা ভাড়া নিয়েছে।"

"কোন্ গয়লানী?" ভুরু দুটো ওপরে তুলে বাবুটি প্রশ্ন করলেন।

"মতি গোয়ালিনী স্যার। মে মাসে এসেছে। ভাড়াটে স্যার ভাল। মাসের প্রথম দিকেই ভাড়া মিটিয়ে দেয়।"

"হু। ভালই তো মনে হচ্ছে। বেশ ভাল।" অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করল বাবুটি। "কই এ খবর তো দাওনি।"

হাত কচলাতে সুরু করল গোপী। আর পঞ্চুর মার মুখ হাসিতে ভরে গেল। সে আদিখ্যেতা দেখাবার জন্যে না অন্য কোনো ঝাল মেটাতে তা বোঝা গেল না, বলল—"কেন গোপী বাবু, বাবুকে বলনি যে নতুন ভাড়াটে এয়েচে?"

একবার পঞ্চুর মার দিকে দাঁত কড় মড় করে তাকাল গোপী, আর তৎক্ষণাৎ বিনীত হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল, "আপনাকে তো আগে বলেছি স্যার, আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন, এসব ছোট কথা।.... ওর স্বামীটি বিয়ের পরই ফেরার। ওর বুড়ো মা আর ও দুধ বেচে খায়। লোক বড় ভাল ওরা।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে সে এখন।" বলে ছড়িটা তু-চার বার মাটিতে ঠুকে নেন বাবু—তারপর হঠাৎ সুর বদলে জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু সে হারামজাদা গেল কোথায়? বিনোদ?"

দিদিমা বুড়ী হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল, "আজ সাতদিন সে জ্বরে বেহুঁশ ছিল বাবু। কলে যেতে পারেনি। আজ গেছে হাসপাতালে ওষুধ আনতে।"

"ওষুধ আনা বার করছি। বাবুর ওষুধ আনার পয়সা থাকে আর ঘর ভাড়া দেবার নাম নেই। ধর্মশালা খুলে বসেছি, না?" বাবু গর্জে উঠলেন।

"কি বলছ গো বাবু?" সুভদ্রা এবার এগিয়ে এল, "মরদটা আজ সাতদিন একদম বেঘোর জ্বরে বেহুঁশ, আর তার ঘর তছনছ করলে। লোকটার দোষ কি হ'ল? পালাচ্ছে না তো? ভাড়া তো দেবেই।"

"তোর মাথা-ব্যথা কেন রে ছুঁড়ি?" পঞ্চুর মা ঝাঁঝিয়ে উঠল।

"তুই থাম।" এক ধমকে পঞ্চুর মাকে থামিয়ে দিল গোপী। বাবুর বর্তমান মনোভাব জানতে তার বাকী নেই। তেজী ঘোড়া পা ঠুকতে শুরু করেছে, মুখে লাগাম পরাতে দেরি করলে তাকেই পস্তাতে হবে।

সে সুর মোলায়েম করে বলল, "তুমি জান সুভদ্রা, বিনোদ সত্যি কোথায় গেছে?"

"দিদিমা তো বললই—ও হাসপাতালে গেছে।"

"ওর ঘর আমরা দখল করলাম। ও আজ তিন মাস ভাড়া দেয়নি। খালি ভাঁড়াচ্ছে।"

"তাহ'লে রোগা মানুষটা যাবে কোথায় ?"

"তোর ঘরে তোল্ না।" পঞ্চুর মা আড়াল থেকে টিপ্পনী কাটে।

ইঙ্গিতে সুভদ্রাকে কাছে ডাকল গোপী, তারপর ফিসফিস করে বলল—"বাবুর কাছে ভাল করে বুঝিয়ে বল। বাবুর দয়ার শরীর—"

"দয়ার শরীর তা দয়া দেখান না কেন।" সজোরে হেসে উঠল সুভদ্রা। সে হাসিতে বাবুর ঠোঁটেও হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "চাবিটা তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দে গোপী। সন্ধ্যের দিকে আবার না হয় খোঁজ নেওয়া যাবে।···তখন যেন বিনোদ থাকে, বুঝলে ?"

বাবু গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসলেন। গোপী আবার ফিরে এল। সুভদ্রা তখনও দাঁড়িয়ে দেখছে উঠানে ছড়ানো একরাশ ভাঙা-ছরানো জিনিসপত্রের দিকে।

গোপী বলল, "বাবু যখন রাতে আবার আসবে, তখন তুমি নিজে বলো বিনোদের জন্য।"

"আমার বয়ে গেছে—তোমার বাবুর কাছে এর লিয়ে খোসামোদ করতে। আমি কি ভাড়া বাকী ফেলেছি ? আজ সাতদিন লোকটা বেঘোরে বেহুঁশ, সে এখন যাবে কুথায় তাই ভাবছি।"

"তুমি একটু বলো না, তাহলেই হবে। বাবুকে বুঝিয়ে বললে বাবু একেবারে জল, বুঝলে!" ব'লে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে শেয়ালের মতো পা ফেলে গোপী বেরিয়ে গেল। অন্য ঘরের বাসিন্দারা তখনো উপস্থিত ঘটনা নিয়ে জটলা করছে। হঠাৎ বেলার দিকে নজর পড়তে সুভদ্রার যেন চমক্ ভাঙল। ইস্ বড় দেরি হয়ে গেল। এখনি যে তাকে জ্যোতিষীর কাছে যেতে হবে।

জ্যোতিষী তাকে দেখেই বলে উঠল, "এত দেরি করলে কেন? আলো পড়ে গেলে হাতের রেখা কি দেখা যায়?"

"কি করব বল? ওরা আদ্মি না জানোয়ার তাই ভাবছি!"

"কারা?" প্রশ্ন করতে গিয়ে জ্যোতিষীর গলা যেন কেমন কেঁপে উঠল।

"আমাদের বস্তির মালিক গো! কি জুলুম জ্বরে বেহুঁশ আদমির উপর!"

"মরুক গে।" আশ্বস্ত হ'য়ে বলল জ্যোতিষী, "আমি বহু গুণে অনেক মন্ত্রের জোরে তার খোঁজ পেয়েছি। তার কাছে আজ তোমাকে রাত ন'টার পর নিয়ে যাব।"

"অত রাতে? কোথায়?"

"এই—কাছেই।"

"তাহলে এখনি চল না? তোমার তো কাজকর্ম হ'য়ে গেছে।"

"না না, আমার জন্য নয়। একটা শুভ সময় চাই তো! না হ'লে মন্ত্র খাটবে কেন?"

সুভদ্রা ছেলেমানুষ নয়। লেখাপড়া বেশি কিছু শিখতে না পারলেও সংসারের জ্ঞান তার ভালই ছিল। ভবিষ্যৎ গণনায় শাস্তার মত একেবারে অবিশ্বাসী না হলেও মন্ত্রতন্ত্রের ক্ষমতার বিষয়েও সে বেহিসেবী রকমের ভরসা রাখত না। একবার তার মনে হ'ল অস্বীকার করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে ভেবে দেখল, মিথ্যাই যদি হয়, তাহলেও তো সব কিছুই তার মিথ্যা হ'য়ে যাবে না। জ্যোতিষীর সঙ্গে হারানো স্বামীর কথায় কথায়, হাত দেখানোর ফাঁকে ফাঁকে নিজের মনটাও কি সে একেবারেই দেখায়নি কখনো? অবিশ্যি শাস্তা যা ভাবে তা নয়, নিছকই বন্ধু! কিন্তু বন্ধু লোককে তো মানুষ অবিশ্বাস করে না। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বলল……

"আচ্ছা যাব! কিন্তু তোমাকে কোথায় পাব ঠাকুর?" তার গলার স্বরে কেমন একটা ব্যাকুলতা যেন ফুটে উঠল।

জ্যোতিষী সেটা লক্ষ্য ক'রে বলল, "সে না হয় আমি তোমার বাসাতেই যাব। কিন্তু একটা কথা, ধর মানুষের মন তো, মন্ত্র হয় তো ভাল করে বলা হয়নি কি কাপড় জামা কিছু অশুদ্ধ ছিল, যা গুনে দেখেছি তা ঠিক হ'ল না…মানে তোমার স্বামীকে হয় তো আজ পাওয়া গেল না, তাতে তোমার রাগ হয়ে যাবে না তো?"

"রাগ? না রাগ কেন হবে? দোসরা দিন আবার দেখব

তাহলে!"

"বেশ বেশ, তাহলে সব ঠিক আছে।" জ্যোতিষী উৎসাহের সঙ্গে বলল, "তুমি কাপড় চোপড় পরে তৈরী থেকো, আমি ঠিক ন'টার সময় যাব।"

সুভদ্রা উঠে পড়ল। আর আপন মনে হাসল। কিন্তু এতদিন বাদে এই প্রথম সে হাসিতে কোন আওয়াজ বেরুল না। তার চোখের দৃষ্টিও যেন অন্য রকম।

সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই সুভদ্রা সাজগোজ সেরে ফেলল। এ বেলায় রান্না করে না। ও বেলার রান্নাই রোজ রাতের জন্য রেখে দেয়। আজ সে সন্ধ্যা লাগতেই মাকে খাইয়ে দিল। নিজের খাওয়া সেরে, কাজকর্ম শেষ করে যখন সে নিজেকে একটু একলা করে পেল, হঠাৎ যেন তখন কেমন ভয় পেল সে। একটা মানুষকে রাস্তায় মাত্র কবার দেখেই এতটা বিশ্বাস করা কি তার ঠিক হচ্ছে? হয় তো সে একটা বুজরুক। হয় তো সে তার সর্বনাশ করে পথে বসিয়ে ভাগবে। এমন যে না হয় তা তো নয়! এই তো সেদিন ওদিকের ঘরের বাসিনী, কাদের বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করতে গিয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসল। তারপর খালাস হতে গিয়ে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কথাটা মনে পড়তেই সুভদ্রা শিউরে উঠল। একবার মনে করল, সাজ খোলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের অন্য কোণ থেকে যেন

একটা ভরসাই পেল সে। সে তো ছেলেমানুষ নয়, জোর করে তাকে কিছু করান তো যেতে পারে না।

কিন্তু গোপীবাবু আসে না কেন? বিনোদটাও সেই থেকে ফেরেনি। যাক গে ছোঁড়া, মরুক গে। সে তার নিজের কর্তব্য করে বাবুকে নিজে একটু অনুরোধ করে চলে যাবে। গোপী বলেছে সাড়ে সাতটার ভেতরেই আসবে তারা।

কিন্তু সাড়ে আটটা বেজে গেলেও তারা এল না, সুভদ্রা সেজেগুজে ঘেমে উঠছিল। গণক ঠাকুর এখনিই আসবে।

রাত ন'টা নাগাদ একটা বাচ্চা ছোঁড়া এসে তাকে চুপি চুপি বলল, "তোমায় ডাকতেছে গো।"

"কে? কোথায়?"

"ওই হোথা। ঘোড় গাড়ীতে।"—বলেই সে যেমন এসেছিল, তেমনি ছুটে চলে গেল।

সুভদ্রা মনে মনে একবার রামজির নাম স্মরণ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

বস্তির একটু দূরেই গলির মধ্যে কারখানার উঁচু পাঁচিলের পাশে একটা ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ী দেখতে পেল সে। গলির ওপাশ থেকে একটা আমগাছ এমন ভাবে ঝুঁকে পড়েছে যে জায়গাটা বেশ অন্ধকার। রাস্তায় লোকজনও দেখা গেল না। সুভদ্রার কেমন গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল।

গাড়ীর কাছে এসে সে বিপন্নভাবে হেসে বলল, "হেঁটে গেলে হ'ত না ঠাকুর।" বলতে বলতে সে গাড়ীতে উঠে বসল।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভূত দেখার মত আঁত্‌কে উঠে নামবার জন্য পা বাড়াতে গেল। ততক্ষণে তার মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কোচয়ানকে গাড়ী ছোটাতে হুকুম দিয়েছে গোপী।

ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডুকরে কেঁদে উঠল সুভদ্রা।

চার-পাঁচ দিন পর বিপর্যস্ত দেহমনে সুভদ্রা যখন বাড়ী ফিরছিল তখনও ভাল করে সকাল হয়নি। হঠাৎ সে দেখতে পেল, অত ভোরেই স্নান সেরে জ্যোতিষী তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিজের জায়গায় বসছে। এক মুহূর্ত সে দূর থেকেই জ্যোতিষীকে ভাল ক'রে দেখল। তারপর অনভ্যস্ত ঘোমটায় মুখ ঢেকে বাড়ীর পথ ধরল।

সমাপ্ত